সোনার দেশ বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সোনার দেশ বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ঝিঙেফুল ঢাকা

www.pathagar.com

সোনার দেশ বাংলাদেশ
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
প্রকাশক ॥ গিয়াসউদ্দীন খসরু
ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৭৪০২৪ ; ০১৭১২৯৭৬৪০৯
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮
চতুর্থ সংস্করণ ॥ সেপ্টেম্বর ২০১৩
স্বত্ব ॥ লেখক
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ॥ আজিজুর রহমান
মুদ্রণ ॥ ঝিঙেফুল প্রেস, ঢাকা-১১০০
মূল্য ॥ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

SONAR DESH BANGLADESH
By Mohammad Abdul Mannan. Published by Giasuddin Khasru on behalf of Jhingephul
34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone : 9574024, 01712976409
Price : Tk. 300.00 Only ; US $ 6.00
E-mail: jhingephul@gmail.com

ISBN : 984-642-133-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ
আমার মা
মরহুমা জোবায়দা বেগমের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে ;
যিনি আমাকে লালন করেছেন,
আমার মতো সব শিশুদের বন্ধু ছিলেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- মন পবনের নাও # ৫
- কাগজ থেকে কাগজীটোলা # ৫৩
- রক্তে রাঙা নীল # ৮৫
- মসলিন ও রেশমের যাদু # ১০৯
- সোনালী আঁশ # ১২৩
- নলের মধু—চিনি # ১৩৭
- লক্ষ থেকে লাক্ষা # ১৪৭

www.pathagar.com

মন পবনের নাও

www.pathagar.com

উজান ভাটির দেশ

নদ নদী খাল ও বিল হাওড়ের দেশ বাংলাদেশ। পদ্মা মেঘনা সুরমা যমুনা ব্রহ্মপুত্র বুড়িগঙ্গা। ইছামতি মধুমতি আত্রাই করতোয়া। কানফুল কর্ণফুলী। হাজারো নদী।

নদীর বুকে পাল তোলা নাও। নীল সাদা লাল সবুজ হলুদ পাল। নিশানের মতো পাল ওড়ে। পতপত। এ দেশের নদী পাড়ের সাহসী ছেলে। মেঘনা নদীর নেয়ে। পদ্মা নদীর মাঝি।

নাওয়ের মাঝি হাল ধরে শক্ত হাতে। গান গায় ভাটিয়ালি সুরে। দাঁড় টানে হেঁইওরে হেঁইও। গুন টানে। কাশবনের ধার ঘেঁষে।

নাও কখনো উজানে যায়। কখনো যায় ভাটির দেশে। নাওয়ে চড়ে নাইয়র যায় গাঁয়ের মেয়ে। সওদা বোঝাই নাও যায় গঞ্জ থেকে গাঁও-গেরামের হাটে। বাড়ীর ঘাট থেকে নদীর বন্দরে। দেশ থেকে দেশান্তরে।

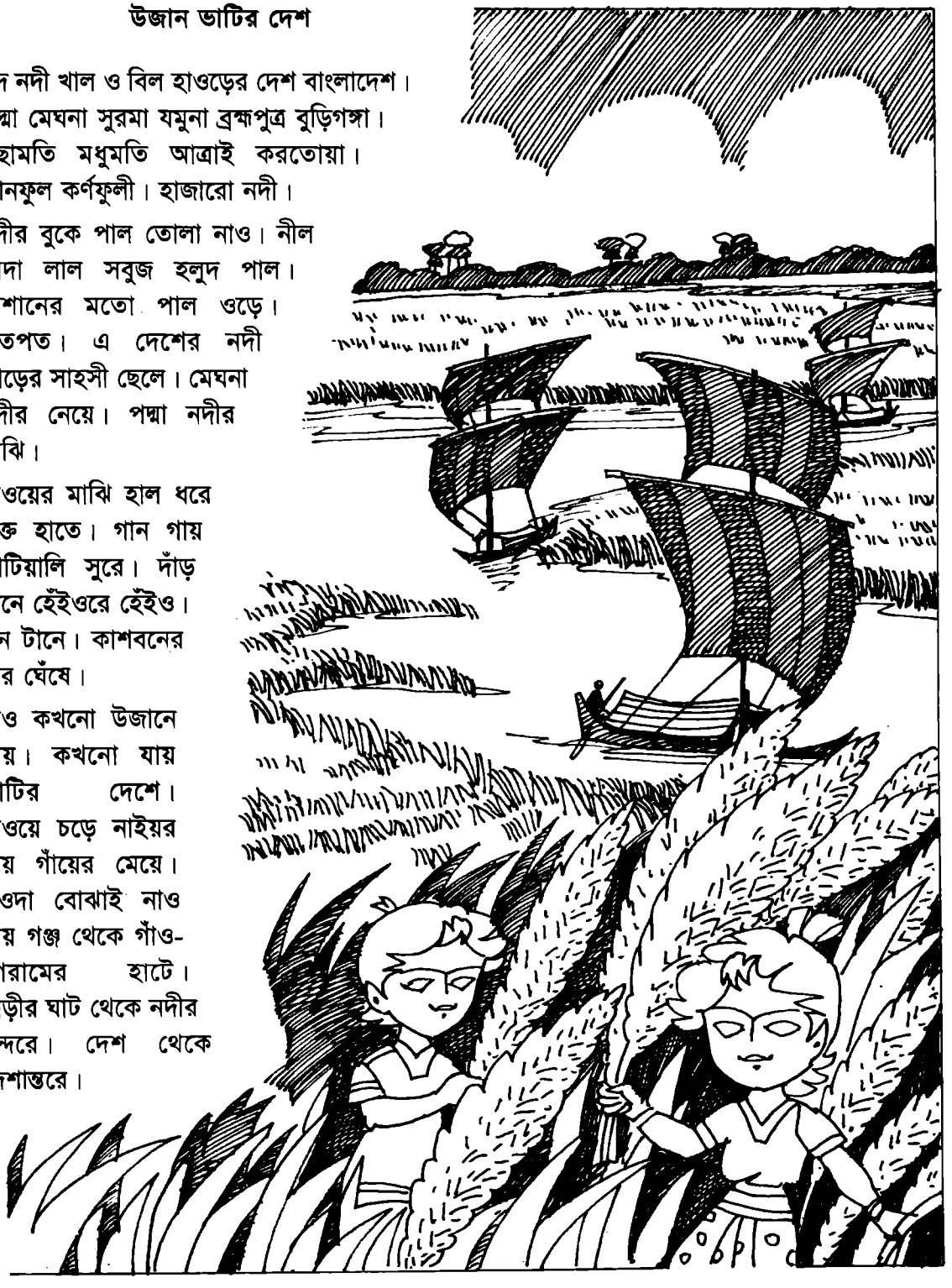

www.pathagar.com

সয়ফল মুলুক যায় কো'কাফের জঙ্গলে

বাংলাদেশের সয়ফল মুলুক। মস্ত বড় সওদাগর। তার ছিল হাজার মাল্লার নাও। সওদা নিয়ে সে নাও যায় বন্দর থেকে বন্দরে। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে যায় কো'কাফের জঙ্গলে। লাল পরী আর নীল পরীর দেশে। সেখানে বন্দী আছে রাজকন্যা। দেও-দানবের ঘরে। সয়ফল মুলুক যুদ্ধ করে। মুক্ত করে রাজকন্যাকে।

আমাদের চাঁদ সওদাগর। তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর। সওদা নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। সাগরে ঝড় ওঠে। ঝড়ে ভাঙ্গে জাহাজের মাস্তুল। ঢেউয়ে ভাঙ্গে হাল। সপ্তডিঙ্গা তলিয়ে যায় কালিধর সাগরে।

পাটাতনের মতো চওড়া তার বুক। বাংলাদেশের নাওয়ের মাঝি। হালের বৈঠার মতো শক্ত তার পেশী। মাস্তুলের মতো উন্নত শির। শত বিপদে মাঝি পিছপা হয় না। অজগরের মতো গর্জন করে নদী। সেই রাগি অজগরের সাথে পাঞ্জা লড়ে মাঝি। পাহাড় সমান ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ তার।

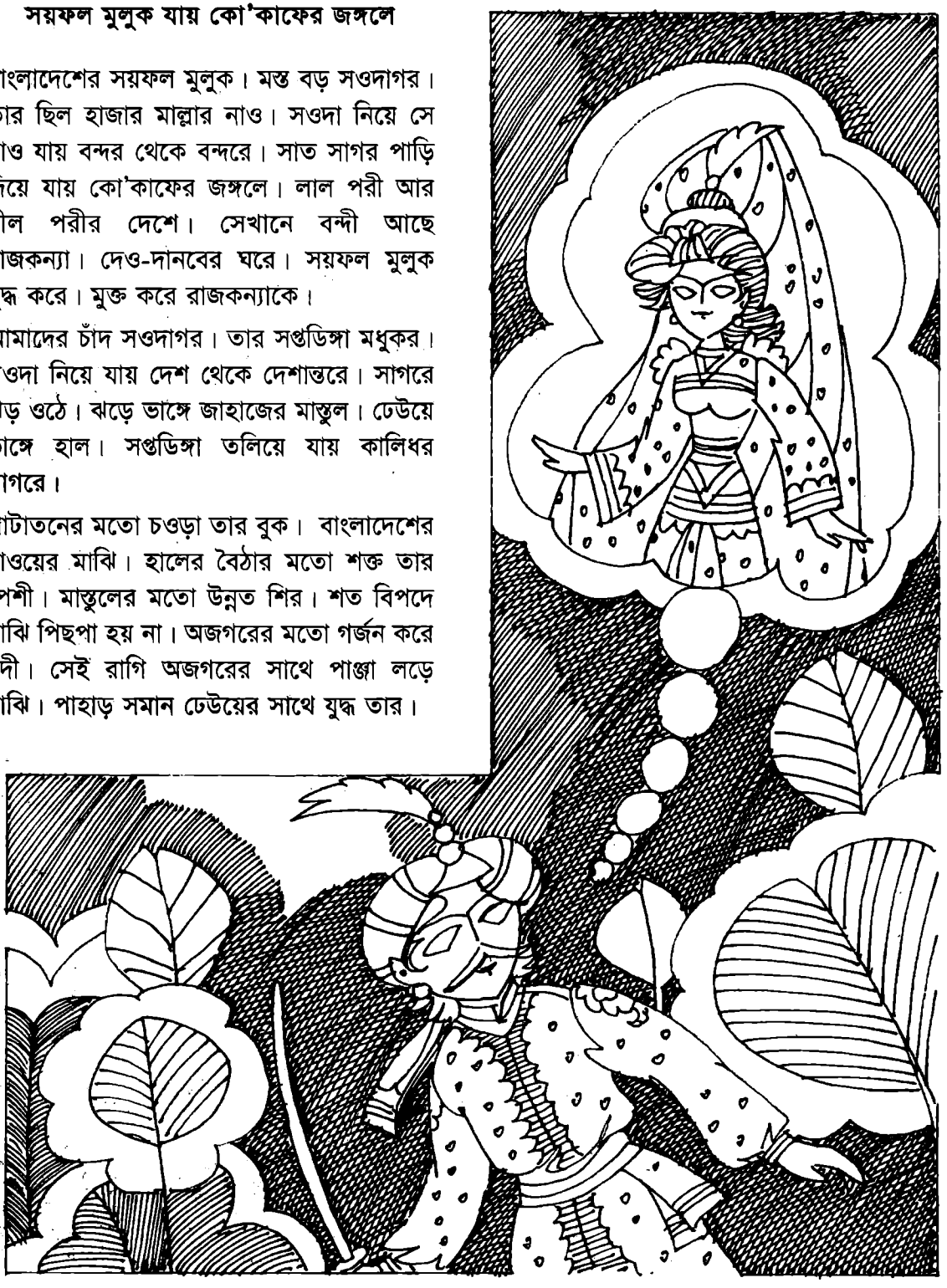

www.pathagar.com

ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা

এ দেশের নদী পাড়ের এক কবি। আহসান হাবিব। তাঁর কবিতায় আছে সেই সাহসী মাঝির কথা ঃ

আমার ঢেউয়ের সঙ্গে গলাগলি
ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা
আমি ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে
কাটাই সারা বেলা
আর দেশ হতে যাই দেশান্তরে
মনের নৌকা বেয়ে
আমি মেঘনা নদীর ছেলে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।

আমাদের ছড়ায়, কবিতায়, গানে, কথায়, কল্পনায় আছে নৌকা। আমাদের হৃদয় জুড়ে আছে নাওয়ের কথা।

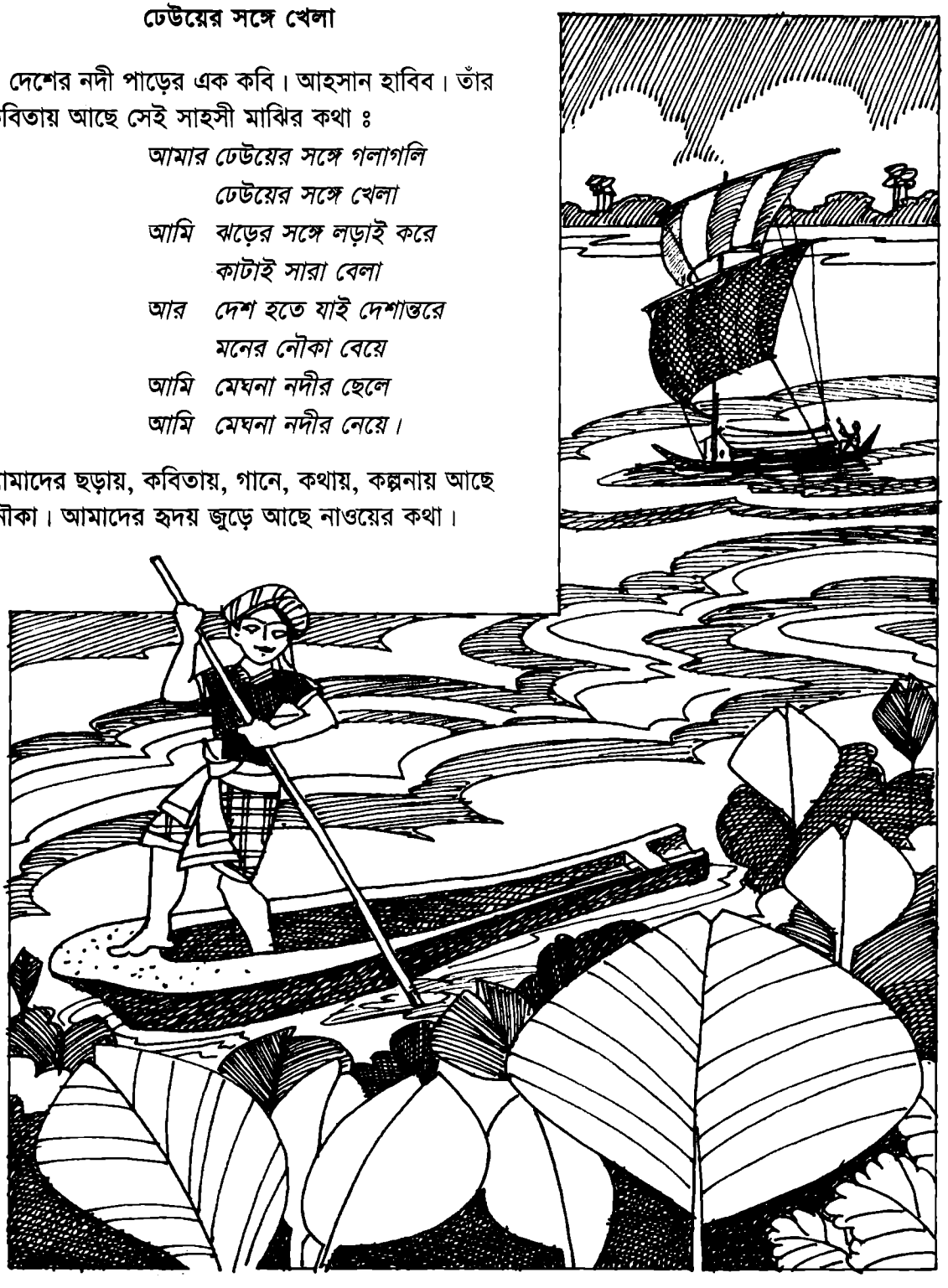

www.pathagar.com

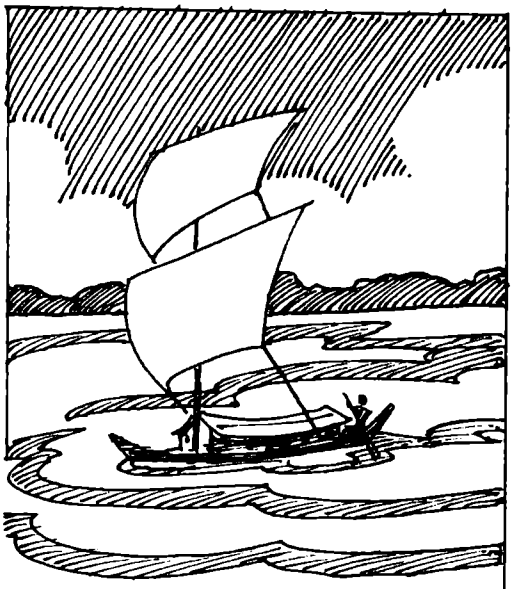

সোনার নাও পবনের বৈঠা

পড়ায় যখন মন বসে না তখন কল্পনায় উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে। সে জন্যও চাই নৌকা। মনটা তখন পবনের নাও হতে চায়। সে ইচ্ছার কথা লিখেছেন নদী পাড়ের আরেক কবি। আল মাহমুদ।

আর কি এখন লাগবে ভালো
গণিত কিংবা গদ্য
তার চেয়ে ঐ অঙ্ক খাতায়
বানাও নতুন পদ্য।
মন পবনের নাও হয়ে যাও
বন্ধ রেখে বইটা
শতেক মাঝির পাল খাটানো
জল ফাটানো বৈঠা।

ছোট্ট সোনামনি দাওয়াত করেছে টিয়া পাখিকে। মিষ্টি সবুজ টিয়া পাখি। দাওয়াত খেতে আসবে নায়ে ভরা দিয়ে।

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।

টিয়া পাখিরও নাও দরকার। মাঝপথে গোল বাধালো বোয়াল মাছটা। নাওয়ের প্রতি তারও ভীষণ লোভ। বোয়ালটা তার ইয়া লম্বা গোঁফে বেঁধে নাও নিয়ে দে ছুট ! টিয়া পাখির বুঝি আর দাওয়াত খাওয়া হলো না !

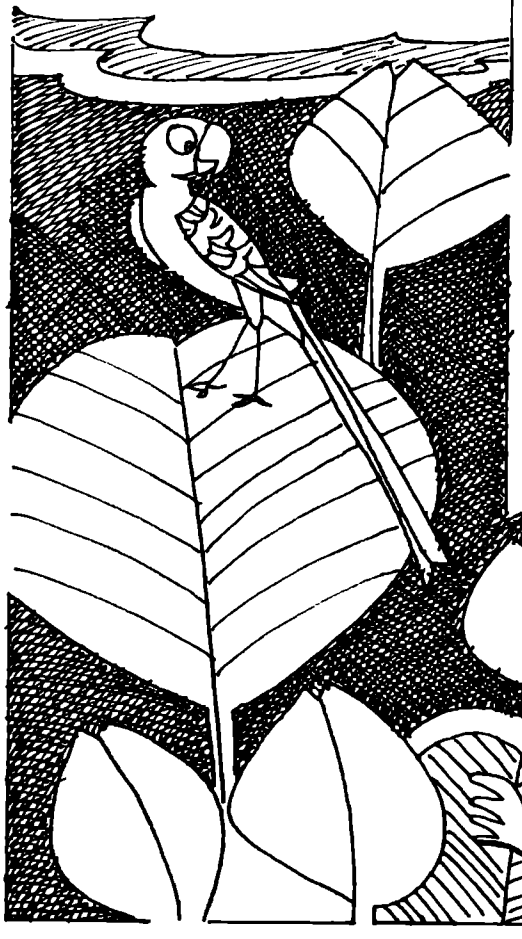

www.pathagar.com

টিয়া পাখি ও নূহ নবীর কিশতী

টিয়া পাখি নায়ে চড়েই একবার প্রাণে বেঁচেছিল। সেটা হযরত নূহ নবীর সময়। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। আল্লাহর হুকুমে হযরত নূহ (আঃ) একটি নৌকা বানালেন। নিজ হাতে কাঠ কেটে। হাতুড়ি পিটিয়ে। মস্ত বড় নাও।

সেবার খুব বড় প্লাবন হলো। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। মাটির নিচ থেকে, উপর থেকে, চারদিক থেকে পানির প্লাবন। মাঠ ঘাট বন বাদাড় পাহাড় পর্বত সব ডুবে গেল পানিতে।

যারা ভালো মানুষ, যারা আল্লাহকে মানে, তারা আশ্রয় পেল নূহ নবীর নৌকায়। আর উঠল সব জাতের প্রাণী। পশু-পাখি। তাদের জোড়া-জোড়া তুলে নেয়া হলো কিশতীতে। নৌকায় যারা ঠাঁই পেলো, তারা প্রাণে বাঁচল। খারাপ লোকেরা ডুবে মরল পানিতে। এটা ছিল আল্লাহকে না মানার ফল।

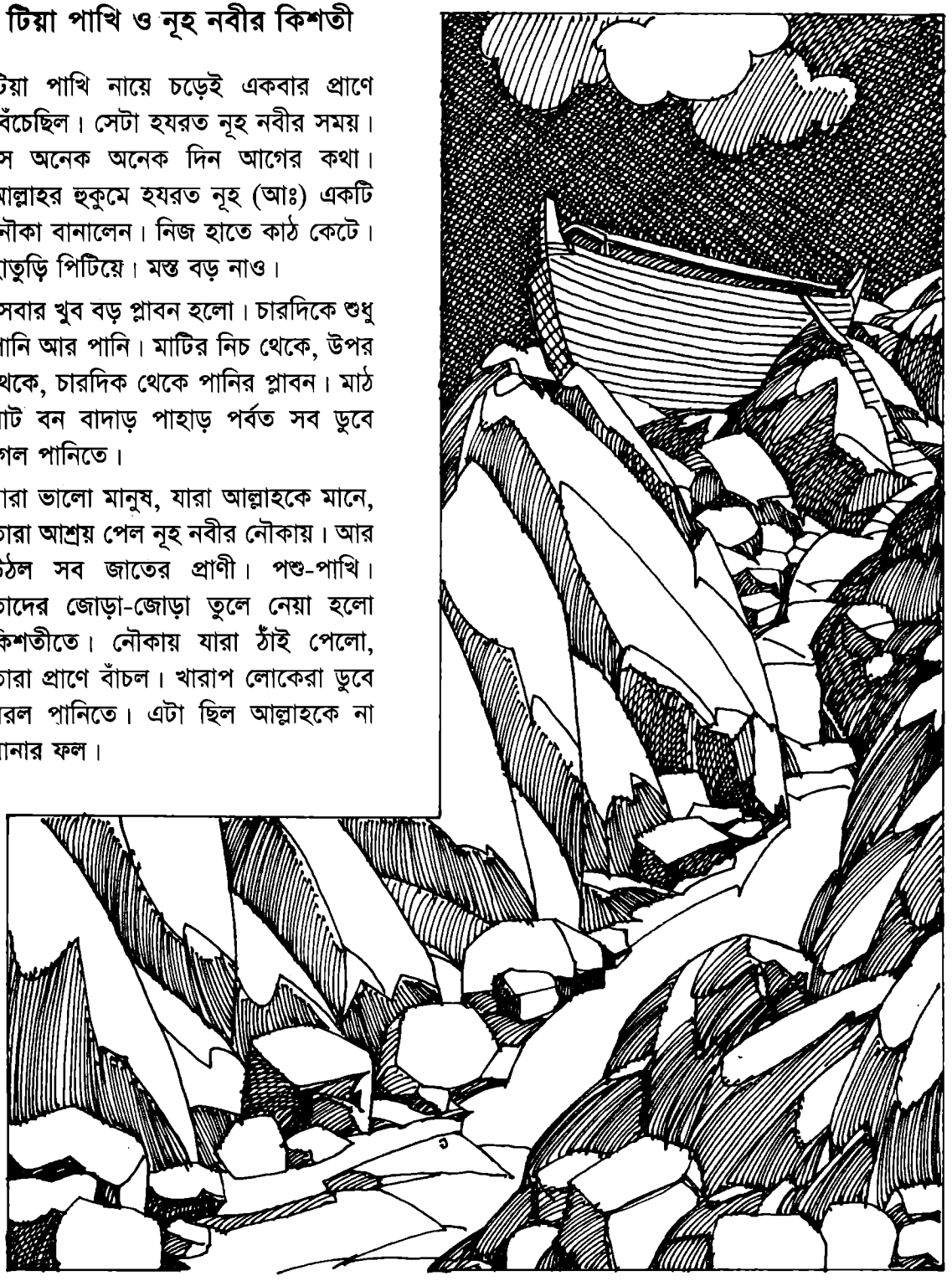

www.pathagar.com

নূহের কিশতীর খোঁজে
চাঁদের নাবিক

প্লাবন শেষে নূহ (আঃ)-এর নৌকা ভিড়ল জুদী পর্বতের চূড়ায়। আর্মেনিয়া থেকে কুর্দিস্তান। বিরাট এলাকা জুড়ে আরারাত পর্বতমালা। তারই একটি চূড়ার নাম জুদী। জুদী পর্বতের কথা আছে আল-কোরআনে। হযরত নূহের নৌকার জন্য বিখ্যাত এই পর্বত। এই কিশতীতে চরেই বেঁচেছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা। দুনিয়ার সব মানুষই সেই মানুষদের বংশধর।

আর সেই টিয়া পাখি। যাকে দাওয়াত করেছে ছোট্ট সোনামনি। সে পাখির আদি পিতা-মাতাও ঠাঁই পেয়েছিল নবীর নৌকায়। নূহের সেই বিখ্যাত নাও খুঁজে পাবার চেষ্টা হয়েছে অনেক। আজো চলছে অভিযান।

১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে একটি খবর ছাপা হলো। নূহ নবীর নৌকার খোঁজ করছেন বিখ্যাত এক লোক। তার নাম জেমস আরউইন। মার্কিন নভোচারী। ১৯৭১ সালে চাঁদে নেমেছিলেন তিনি। রকেটে চড়ে।

'চাঁদের কিশতী'র সেই 'নাবিক' তালাশ করছেন নূহের ঐতিহাসিক নাও। বিমান থেকে অনেক ছবি তোলেন। জুদি পর্বত চূড়ার ছবি। তারপর আরো অনেক অভিযান। অবশেষে উদ্ধার হয়েছে নূহ নবীর কিশতীর নিশানা। সে এক মস্ত খবর।

www.pathagar.com

হরেক রকম নাও

নাও আমাদের হরেক রকম। নৌকা, কোষা, বজরা। ডিঙ্গি, ছিপ। পানুয়া, পটল, সরেঙ্গা, কোলান্দিয়া। পলওয়ার, নাওধুরী, সেরদারী। খেলনা, জংভেদী, সুলুপ ও সাম্পান, আরো কত বিচিত্র নাম। বিচিত্র রকম। সংখ্যায় নাও অগণন। যেন নদীর ঢেউ। গুণে শেষ করা যায় না।

www.pathagar.com

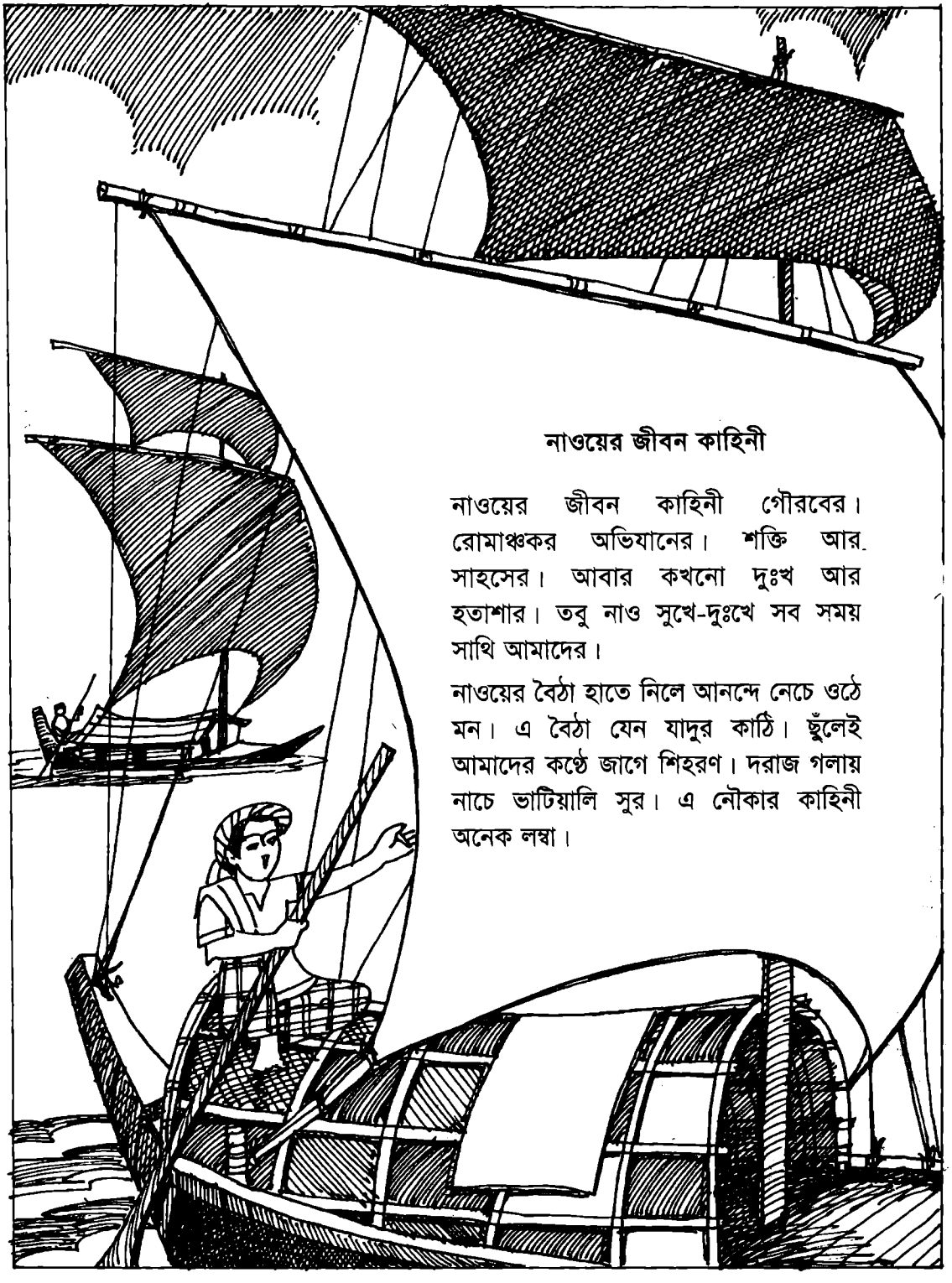

নাওয়ের জীবন কাহিনী

নাওয়ের জীবন কাহিনী গৌরবের। রোমাঞ্চকর অভিযানের। শক্তি আর সাহসের। আবার কখনো দুঃখ আর হতাশার। তবু নাও সুখে-দুঃখে সব সময় সাথি আমাদের।

নাওয়ের বৈঠা হাতে নিলে আনন্দে নেচে ওঠে মন। এ বৈঠা যেন যাদুর কাঠি। ছুঁলেই আমাদের কণ্ঠে জাগে শিহরণ। দরাজ গলায় নাচে ভাটিয়ালি সুর। এ নৌকার কাহিনী অনেক লম্বা।

www.pathagar.com

ডোঙ্গা আর ভেলার মাঝিরা

আমাদের দেশে নাওয়ের ব্যবহার শুরু হয় কয়েক হাজার বছর আগে। গাছের গুঁড়ি খোদাই করে ডোঙ্গা নৌকা বানানো হতো। কয়েকটি গাছ একসাথে বেঁধে তৈরি হতো ভেলা। ডোঙ্গা আর ভেলায় চরেই চলত পারাপার। ডোঙ্গা আর ভেলায় চরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড় বড় নদী পাড়ি দিতেন

তালগাছের গোড়ার অংশ দিয়ে বানানো তালের নৌকা বা ডোঙ্গা এখনো বাংলাদেশের লোকেরা ব্যবহার করে।

ডোঙ্গা আর ভেলার উন্নতি হলো নৌকায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো নৌ শিল্পের কেন্দ্র। দেশের নানান জায়গায়। আমাদের নৌশিল্পীরা দক্ষ কারিগর। তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো দেশে-বিদেশে। সবখানে।

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন কবি কালিদাস। ভিনদেশী এই কবিও আমাদের নৌশিল্পের উল্লেখ করেছেন। কালিদাস তাঁব কাব্যে আমাদের পরিচয় লিখলেন ঃ বাঙালী নৌশিল্প বিশারদ।

www.pathagar.com

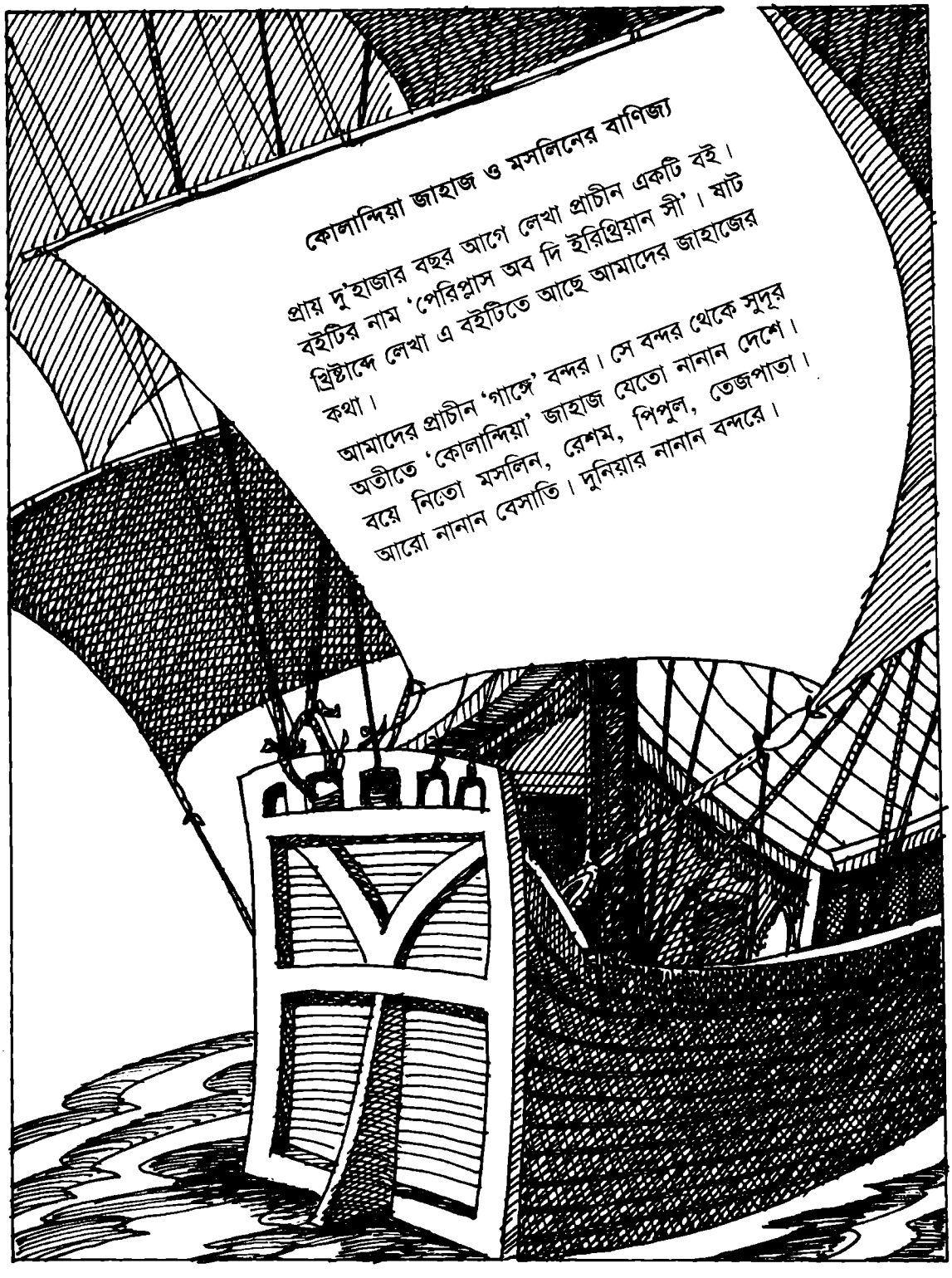

www.pathagar.com

চীন জাপান আরব সফর

দু'হাজার বছর আগে এ দেশে ছিল বৌদ্ধ রাজত্ব। বৌদ্ধদের প্রাচীনতম বই 'মিলিন্দ পান হো'। লেখা হয় প্রথম খ্রিস্টাব্দে। এই বইতে আছে নৌ চলাচলের জন্য বিখ্যাত কয়েকটি দেশের নাম আর সে তালিকায় আছে বাংলা দেশের নাম আর বাংলাদেশের নৌকার কথা।

দেশী-বিদেশী অনেক নৌযান ভীড় করতো আমাদের বন্দরে। সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে ভিড়তো আরবদের পাল তোলা জাহাজ। আরব বণিকরা আসতেন আমাদের দেশে। তারাই আমাদের দেশে প্রথম ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

সেই সুদূর অতীতে আমাদের দেশের বহু লোক দূর দেশ সফর করতেন। তখন কলের জাহাজ ছিল না। ছিল পাল তোলা জাহাজ। সওদাগররা নানান জাতের সওদা নিয়ে যেতেন চীন, জাপান, কোরিয়া, জাভা, সুমাত্রা আর শ্রীলঙ্কার বন্দরে। আরব দেশেও পাড়ি জমাতেন তারা।

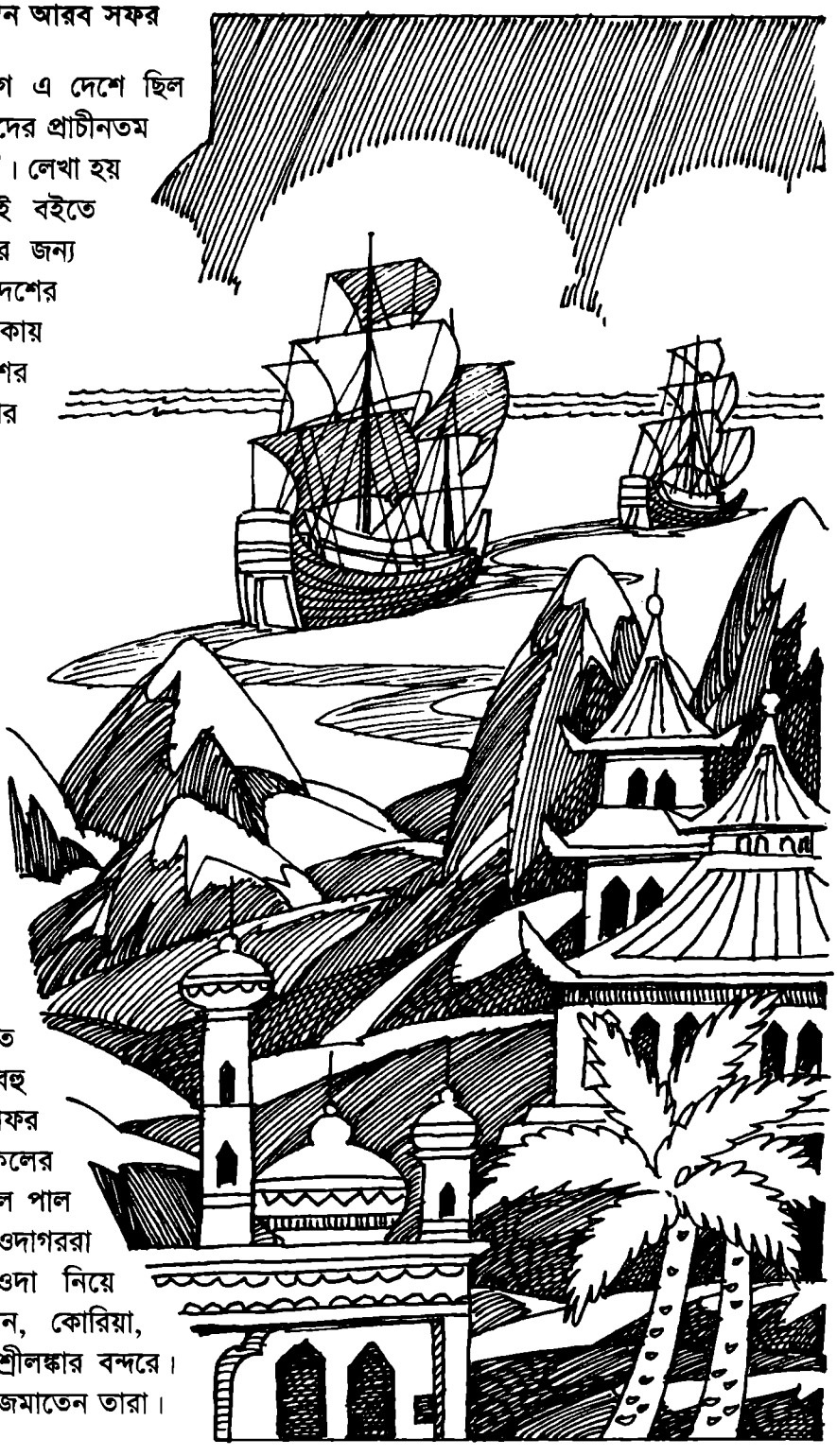

www.pathagar.com

বরোবুদুর মন্দিরে

জাভাতে বিখ্যাত একটি মন্দির। নাম তার বরোবুদুর। সেই প্রাচীন মন্দিরের গায়ে আঁকা আছে আমাদের নৌকার ছবি আমাদের নৌকা প্রাচীনকালে বিদেশে যেত। এ ছবি তার প্রমাণ।

আগের দিনে বড় বড় ঘটনা লিখে রাখা হতো তামার পাতে তেমনি একটি প্রাচীন তাম্রলিপি পাওয়া গেছে ফরিদপুরে। সেই লিপিতে আছে আমাদের 'নবাত ক্ষেণী' বা জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রের কথা।

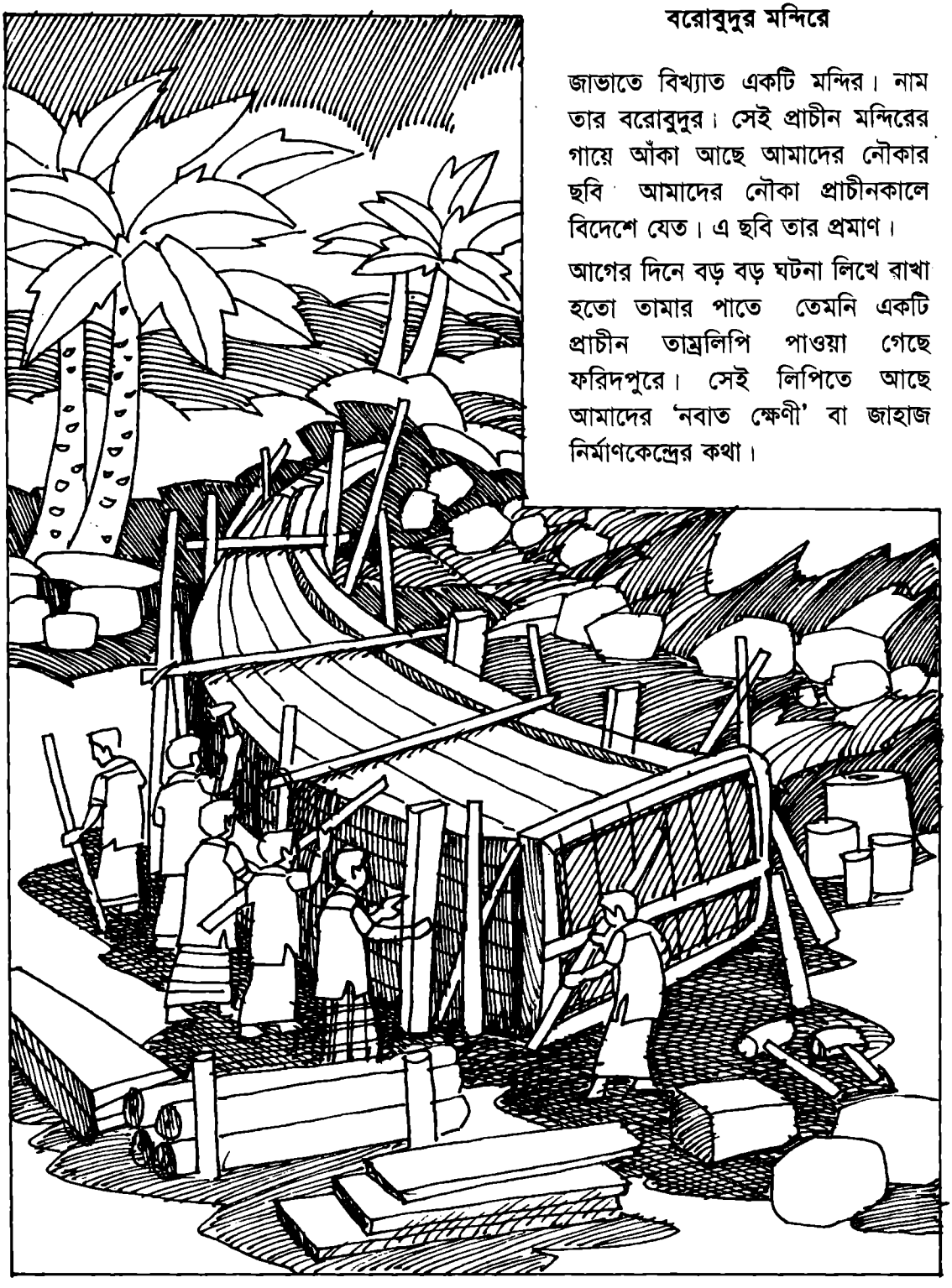

www.pathagar.com

মার্কোপোলোর চোখে বাংলাদেশের নাও

বাংলাদেশের নৌশিল্প সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় বিশ্বখ্যাত বিদেশী পর্যটকদের কাছেও। দুনিয়ার নানান দেশের সাথে বাংলাদেশের চমৎকার যোগাযোগ ছিল। সে সুযোগে অনেক পর্যটক এসেছেন এদেশে। তারা লিখেছেন আমাদের সোনালী অতীতের কথা।

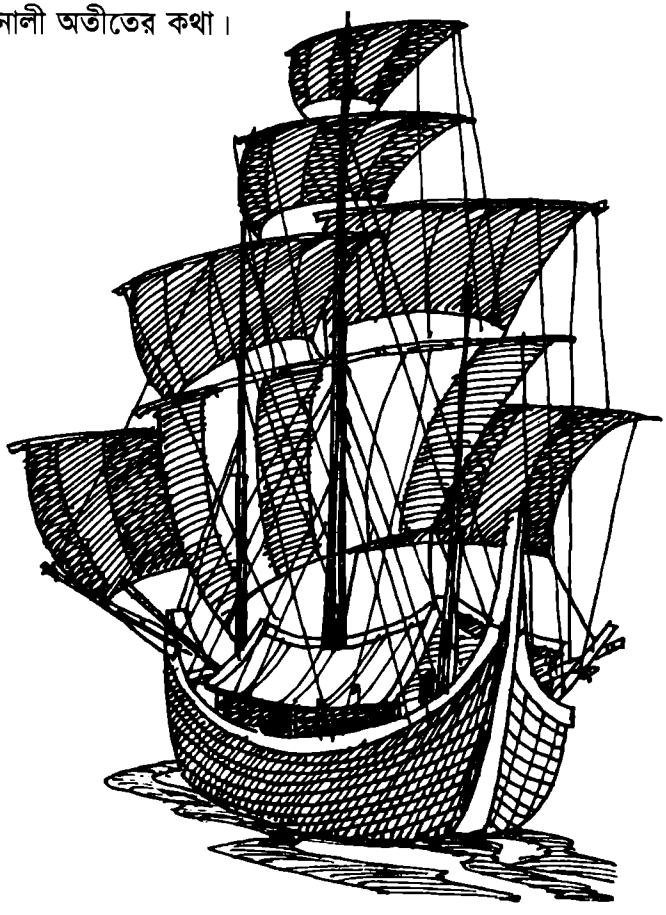

সাত শ' বছর আগের কথা। তেরো শতকে বাংলাদেশ সফর করেন মার্কোপোলো। মার্কোপোলোর কাছ থেকেই তখনকার নৌকা সম্পর্কে সবচে' বেশী তথ্য জানা যায়।

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলো তৈরি হতো দুই প্রস্থ তক্তা দিয়ে। তার ওপর আরেক প্রস্থ কাঠের আচ্ছাদন। চুন আর শোন গুঁড়া করা হতো। সেই সাথে মিশানো হতো এক প্রকার গাছের তেল। সে তেল মাখা হতো জাহাজের তলায়। বড় বড় জাহাজ তৈরির জন্য ব্যবহার হতো ফার জাতের কাঠ।

সে জাহাজ কেমন হতো ? পাহাড় সমান ঢেউয়ের বুকে কিভাবে রক্ষা পেত! সে কথাও লিখেছেন মার্কোপোলো। জাহাজের ডেকের নিচে থাকতো সারি সারি কেবিন। একেকটি কেবিন ব্যবহার করতেন একেকজন সওদাগর। জাহাজের আয়তন অনুযায়ী কেবিনের সংখ্যা কম-বেশি হতো। মার্কোপোলো একটি জাহাজে দেখেছেন ষাটটি কেবিন।

প্রতিটি জাহাজের থাকতো কয়েকটি অংশ। যেনো ট্রেনের আলাদা বগি। একটি অংশ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাহাজের বাকী অংশ রক্ষা পেত। বিধ্বস্ত অংশের যাত্রী ও মাল সরানো যেতো অন্য ভাগে। যত বড় জাহাজ, তত বেশি অংশ থাকতো। মার্কোপোলো কোন কোন জাহাজে তেরোটি অংশ দেখেছেন। একেকটি জাহাজে নাবিক থাকতো দেড়শ' থেকে তিনশ'। প্রতি দাঁড়ে চারজন করে মাল্লা। একেকটি জাহাজ পাঁচশ' থেকে ছয় হাজার বস্তা পর্যন্ত জিনিশ বহন করতো। প্রতি বস্তায় দুই-আড়াই মণ মাল। সে হিসাবে পনেরো হাজার মণ পর্যন্ত মাল বহন করতো একেকটি জাহাজ।

প্রতিটি জাহাজের সাথে থাকতো কয়েকটি ছোট নৌকা। জাহাজের নোঙ্গর ফেলা এবং আরো অনেক কাজ করতো এসব ডিঙ্গি নৌকা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাহাজে ইবনে বতুতার চীন সফর

মরক্কোর ইবনে বতুতা। চৌদ্দ শতকের ভূ-পর্যটক। দুনিয়া-জোড়া নাম তাঁর। দুনিয়ার বহু দেশ ঘুরে তিনি আসেন বাংলাদেশে। ইবনে বতুতা সিলেট সফর করেন। সাক্ষাত করেন হযরত শাহজালাল-এর সাথে। সফর করেন রাজধানী সোনারগাঁও। প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্ তখন বাংলার শাসক। ইবনে বতুতার দেখা সোনারগাঁও তখন এক সমৃদ্ধ বন্দর।

প্রাচীনকাল থেকে দেশী-বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ ভিড়তো এই বন্দরে। ইবনে বতুতা এখানে দেখেছেন তলাচ্যাপ্টা পাল তোলা জাহাজ। মাল বোঝাই করে জাভা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাগর পাড়ি দিয়ে এসব জাহাজ যেত চীন, জাভা, পেগু আর সুমাত্রার বন্দরে।

ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমাদের জাহাজে করেই জাভা ও চীন সফর করেন।

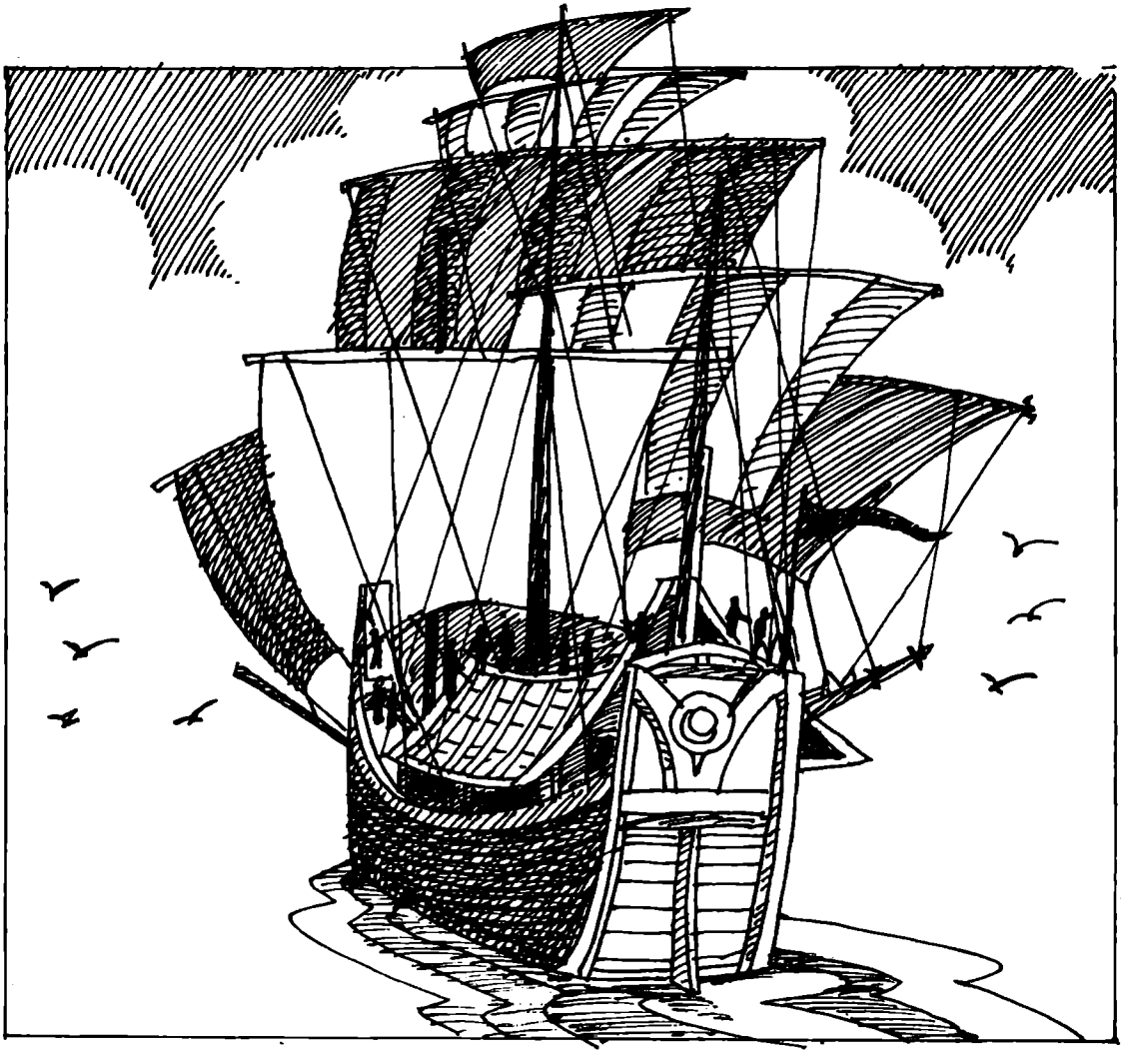

www.pathagar.com

চিড়িয়াখানার সমুদ্র ভ্রমণ

১৪১৪ সালের কথা। সোনারগাওয়ের সুলতান চীনের সম্রাটের জন্য উপহার পাঠালেন। জীরাফ আর বিখ্যাত তাজী ঘোড়াসহ ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানা। সুলতানের দেয়া এই চিড়িয়াখানা সাগর পাড়ি দিল এদেশে তৈরী পাল তোলা জাহাজে চড়ে। এছাড়া মাহুয়ানও দেখেছেন সোনারগাও থেকে জাভা পর্যন্ত নিয়মিত জাহাজ চলাচল।

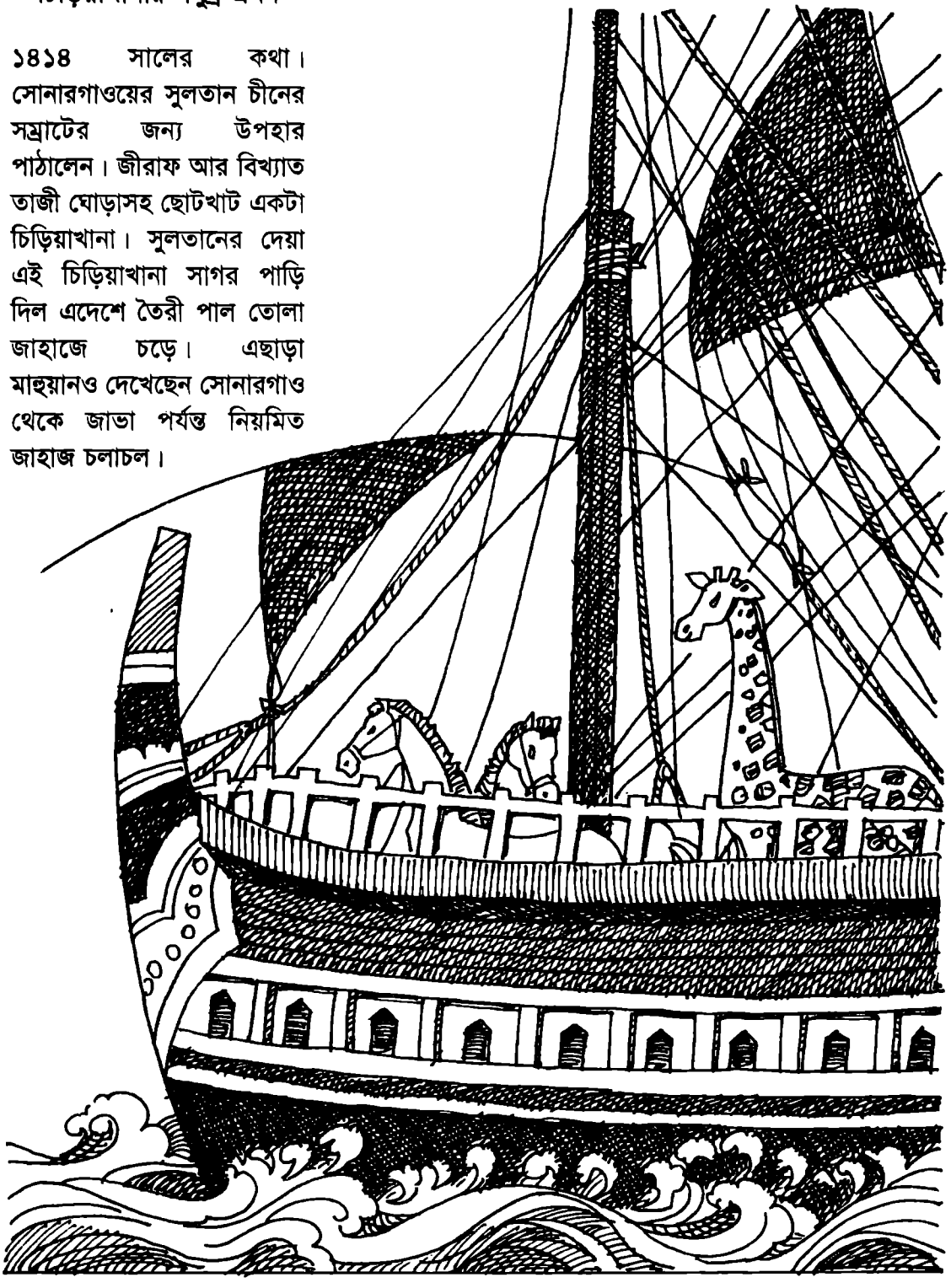

www.pathagar.com

নিকোলকন্‌টির দেখা 'বাংলাদেশের টাইটানিক'

পনেরো শতকে এ দেশ সফর করেন নিকোলকন্‌টি। বাংলাদেশে তখন মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ। এ সময় নিকোলকন্‌টি দেখেছেন বড় বড় জাহাজ। এ সব জাহাজের কোন কোনটি কুড়ি থেকে চব্বিশ হাজার মণ মাল বয়ে নিত। ইউরোপে এতবড় জাহাজ তিনি কখনো দেখেননি। সে কথাও বলেছেন নিকোলকন্‌টি। সে বিশাল জাহাজ যেন বাংলাদেশের টাইটানিক। এসব বড় জাহাজে পাঁচটি পাল আর পাঁচটি মাস্তুল থাকতো।

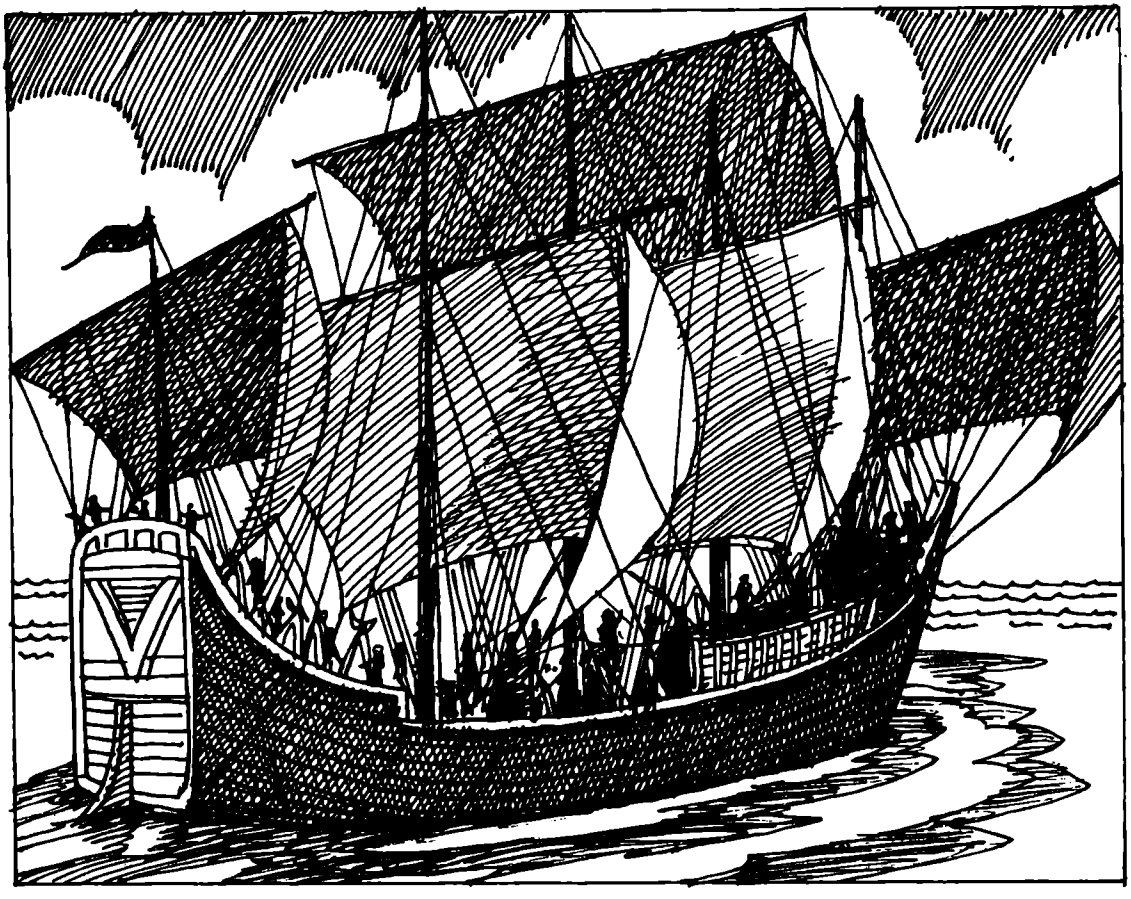

নিকোলকন্‌টির দেখা আমাদের জাহাজ। সে জাহাজের খোল তৈরি হতো তিন প্রস্থ মোটা কাঠ দিয়ে। জাহাজের এক অংশ ধ্বংস হলে বাকি অংশ ভেসে বেড়াতো সাগরে। দু'শ' বছর আগের মার্কোপোলোর তথ্যের সাথে নিকোলকন্‌টির বিবরণের অনেক মিল।

নিকোলকন্‌টি লিখেছেন এদেশের অনেক বড় বড় সওদাগরের কথা। তাদের কারো কারো চল্লিশটি নিজস্ব জাহাজ ছিল। প্রতিটির দাম পনেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা। একেক জাহাজে করে তারা নানা দেশে পাড়ি দিতেন একেক পণ্য নিয়ে। এই বিবরণ বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানী আমলের।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের বালামী

বাংলাদেশের নৌ শিল্পের প্রধান এক কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। জাহাজ তৈরিতে চট্টগ্রামের সুনাম ছিল দুনিয়ার নানা প্রান্তে। চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণে সবচে দক্ষ ছিল 'বালামী' সম্প্রদায়। এই বালামীদের নামে আজো চালু আছে বালাম নাও। বালাম নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন নৌশিল্পীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চট্টগ্রামে তৈরি হতো নানা ধরনের নৌকা ও জাহাজ। বালাম, গোঠা, সুলুপ। সারেঙ্গা, সাম্পান, কোন্দা। সাগরগামী জাহাজ।

সাগরে চলার জাহাজে লোহার পেরেক থাকতো না। তক্তা আর কাঠ জোড়া লাগানো হতো গোল্লা বেত দিয়ে। বেত দিয়েই আটকানো হতো জাহাজের নানা অংশ।

খুবই মজবুত আর সুন্দর ছিল সে কাজ। দক্ষ শিল্পী ছিল আমাদের সে সব নৌকার কারিগর। লোহার পেরেক না থাকায় সাগরের লোনা পানি কোন ক্ষতি করতে পারতো না জাহাজের। কাঠের জোড়া, ছিদ্র বা শ্যামা বন্ধ করা হতো দড়ি, তুলা আর ধুনার সাহায্যে। এ কাজেও দক্ষ ছিল কারিগরদের হাত। ফলে জাহাজে পানি চুয়াতে পারতো না।

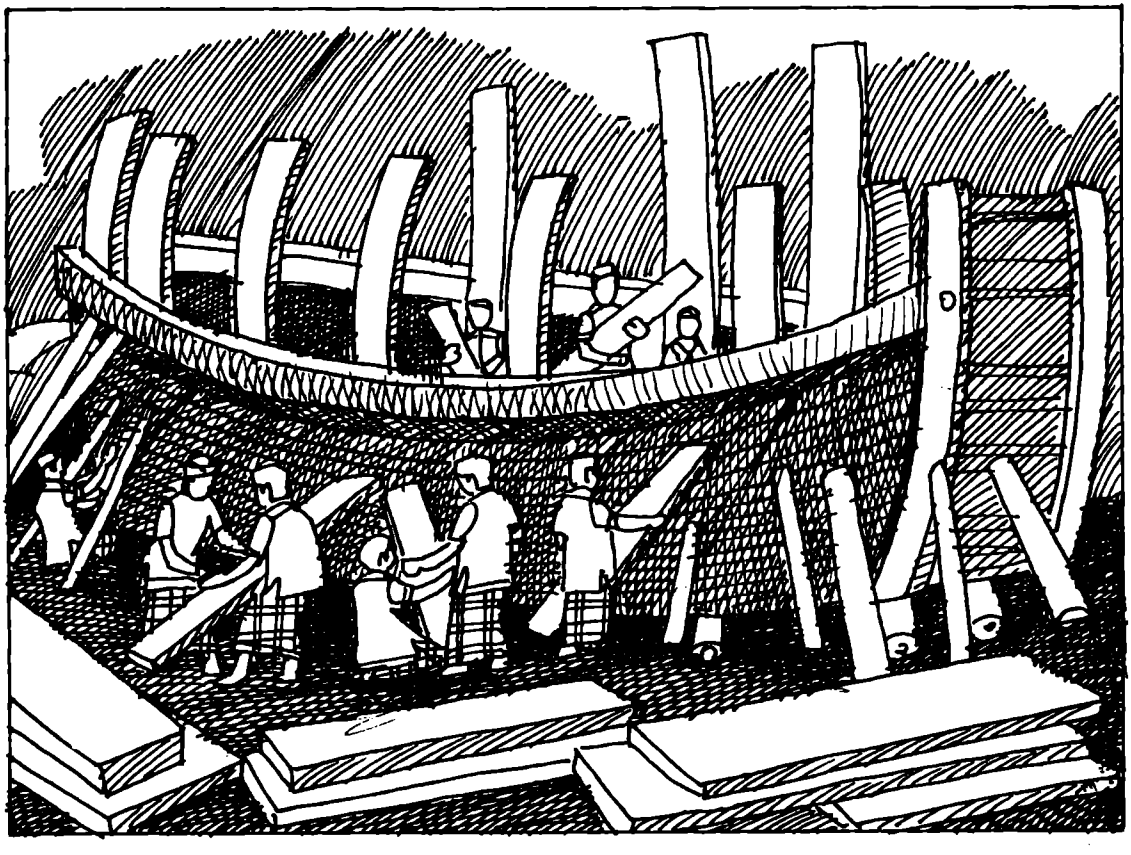

www.pathagar.com

সন্দ্বীপের জাহাজের তুরস্ক যাত্রা

জাহাজ তৈরির বড় ও বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল সন্দ্বীপ। সন্দ্বীপের কারিগরদের নাম-ডাক আর যশ ছড়িয়ে পড়েছিল দুনিয়ার নানান দেশে।

সন্দ্বীপে প্রচুর কাঠ পাওয়া যেত। তাই জাহাজ বানানোর সুবিধা ছিল অনেক। এখানকার জাহাজের দাম পড়ত কম। আর মানে-গুণে এ জাহাজ ছিল সেরা।

তুরস্কের সুলতান তখনকার দুনিয়ার নেতা। তিনিও জেনেছিলেন সন্দ্বীপের জাহাজের খ্যাতি। সন্দ্বীপ থেকে অনেক জাহাজ তৈরি করিয়ে নেন তুর্কী সুলতান।

এর আগে তুরস্ক জাহাজ সংগ্রহ করতো মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে। আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ সুলতানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের জাহাজ সুলতানকে মুগ্ধ করলো। জাহাজ নির্মাণের প্রতিযোগিতায় সন্দ্বীপ জয়ী হলো আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর।

সন্দ্বীপের জাহাজের কথা লিখেছেন বিখ্যাত পর্যটক সিজার দি ফ্রেডারিক। ষোল শতকের এই পর্যটক সন্দ্বীপে দেখেছেন জাহাজ নির্মাণ-কেন্দ্র। দেখেছেন জাহাজের বিরাট বহর।

সন্দ্বীপ থেকে তখন লবণ রফতানি হতো। লবণ নিয়ে নানা জায়গায় যেত আমাদের জাহাজ। প্রতি বছর লবণ যেত দু'শ জাহাজের বহরে।

www.pathagar.com

তামার পাতে সিলেটের নাম

বাংলাদেশের জাহাজ তৈরির আরেকটি প্রাচীন কেন্দ্র সিলেট। সিলেটের রয়েছে বিপুল বন-সম্পদ। ভালো কাঠ পাওয়া যেত এসব বনে। এসব কাঠ দিয়ে তৈরি হতো উন্নত মানের জাহাজ। জাহাজ নির্মাণে সিলেট ছিল খুবই বিখ্যাত।

ভাটেরার তাম্রফলক। তাতে আছে সিলেটের ঈশানদেবের যুদ্ধ জাহাজের কথা।

মোগল আমলের নৌশিল্পেও সিলেটের খুব সুনাম ছিল। সিলেটের লাউরের রাজা কর দিতেন মোগল সম্রাটকে। মোগলরা সিলেটের রাজার কাছ থেকে টাকা-পয়সা কর নিতেন না। কর হিসেবে নিতেন যুদ্ধ জাহাজ। সিলেটের জাহাজ ছিল মোগলদের প্রিয়।

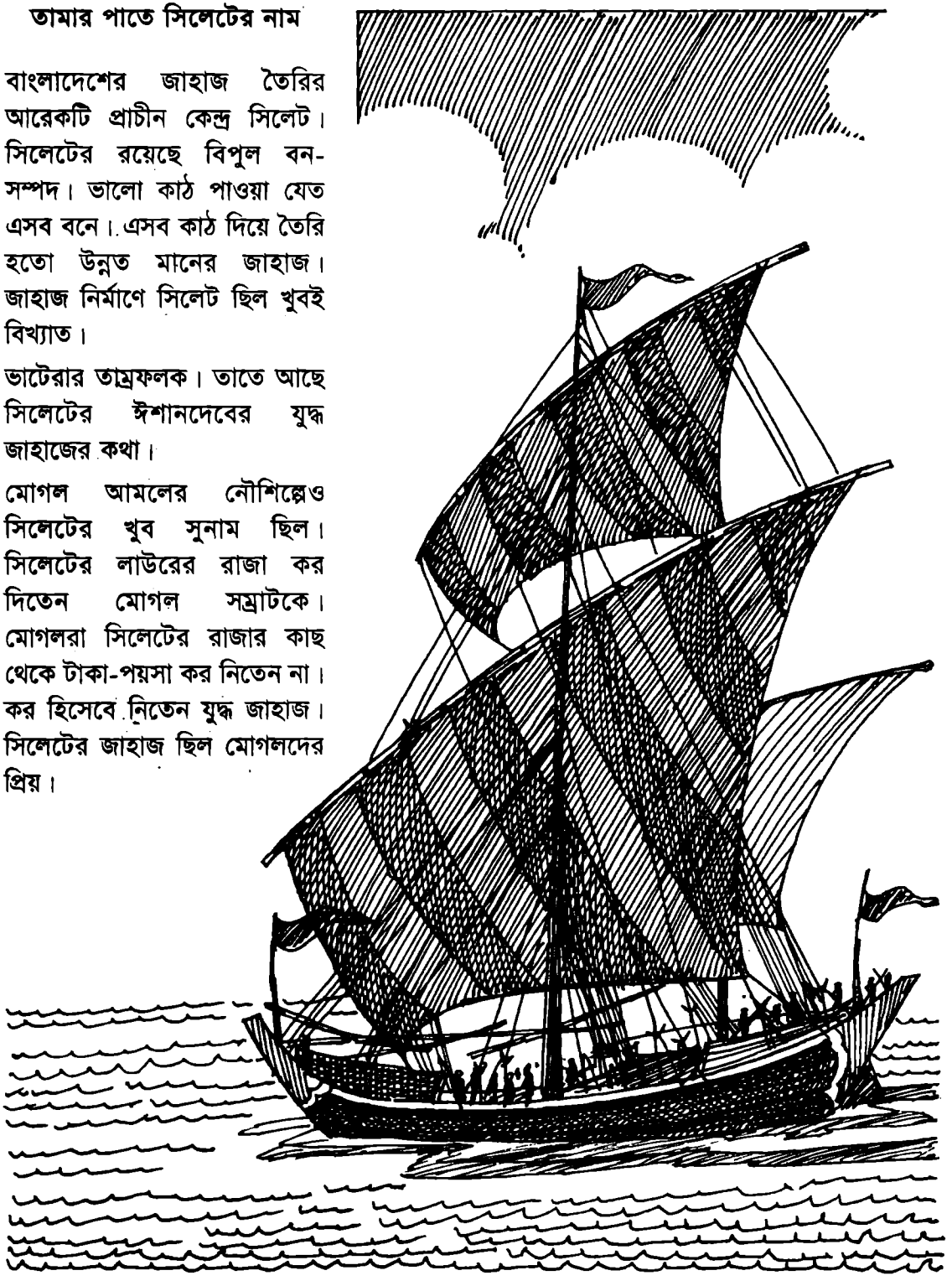

www.pathagar.com

ঢাকার জাহাজ শিল্প

জাহাজ নির্মাণে ঢকা বিখ্যাত ছিল মোগল আমলে।

সতেরো শতকের ভূপর্যটক টেভারনিয়ার শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় বিশাল জাহাজ তৈরি হতে দেখেছেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, সে আমলের জাহাজ শিল্পের চরম উন্নতির কথা।

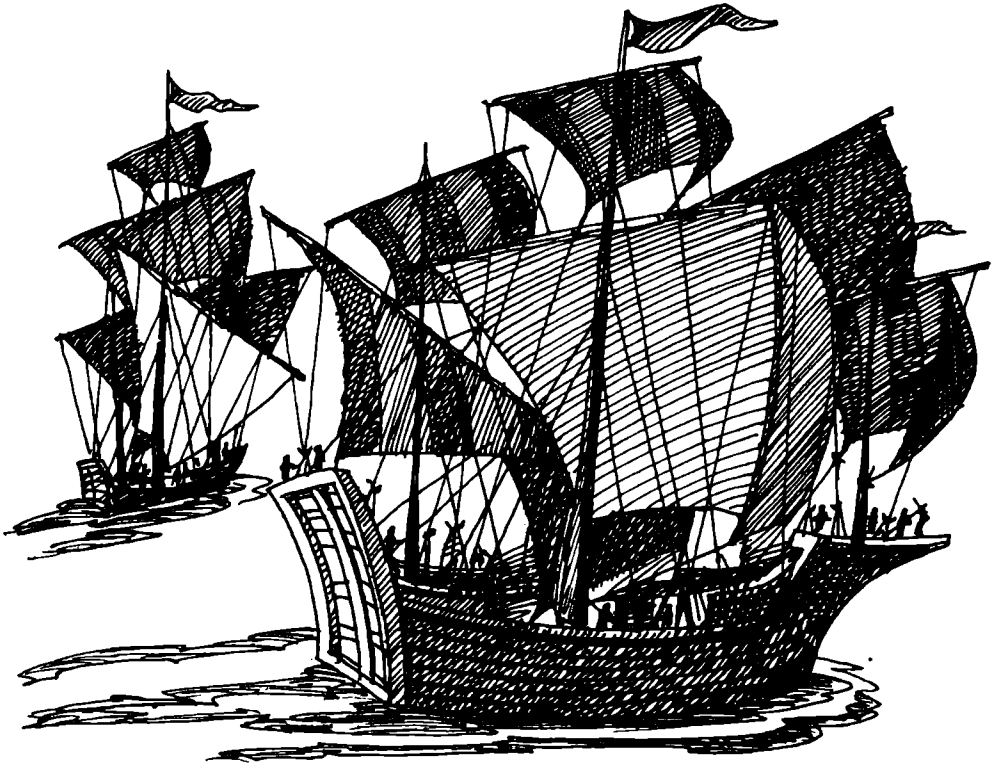

সে সময় ঢাকা সফর করেন টমাস বাউরি। তিনিও ইংরেজ পর্যটক। ঢাকার জাহাজ নির্মাণ কারখানা সম্পর্কে বাউরি জানিয়েছেন অনেক চমৎকার তথ্য।

তিনি লিখেছেন 'পাতেলা' নামক তলা চ্যাপ্টা জাহাজের কথা। চার থেকে ছয় হাজার মণ মাল নিয়ে এ জাহাজ সাগর পারি দিত।

নদীপথে সে সময় চালু ছিল অনেক জাহাজ। ওলোয়াকো, বাজেরো, পারগু, ভূরা, মাসুল, কাঁটামারণ। আরো কত কি!

শায়েস্তা খানের আমলে বড় বড় জাহাজ বিপুল পণ্য নিয়ে পাড়ি দিত শ্রীলঙ্কা ও মধ্যপ্রাচ্যে।

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, সিলেট, ঢাকা ছাড়াও নৌশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল শ্রীপুর, বরিশাল, যশোর, আর চিলমারী বন্দর।

www.pathagar.com

নছর মালুমের কিচ্ছা

আমাদের নৌকার বর্ণনা আছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। আমাদের লোকগীতি, পালা গান, মঙ্গল কাব্যে আর গানে আছে নৌকার কাহিনী।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় আছে নছর মালুমের কথা। এসব পালা গানে সাগর পাড়ি দেওয়া জাহাজের কথা আছে।

কূল-কিনারাহীন অথৈ সাগর। সেই সাগরে পাহাড় সমান ঢেউ। সেই ঢেউয়ের সাথে লড়াই করে দরিয়ার মাঝি নছর মালুম।

বাহির দরিয়ায় যখন
আসিল দুলুপ।
ঝাপটাইন্যা বয়ারে পড়ি
রইল ডুপ ডুপ ॥
নছর মালুম যাইয়া
ধরিল ছুয়ান।
সাইগরে উঠিছে ঢেউ
মুড়ার সমান ॥

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের পাতায় পাতায় আছে সাহসী নাবিকদের কথা। নছর মালুমের মতো সাহসী মানুষের কথা। নাবিক আর নাওয়ের কাহিনী। তাদের সাহসী অভিযানের কথা। আমাদের পাল তোলা জাহাজের কথা। সপ্তডিঙ্গা মধুকরের কথা।

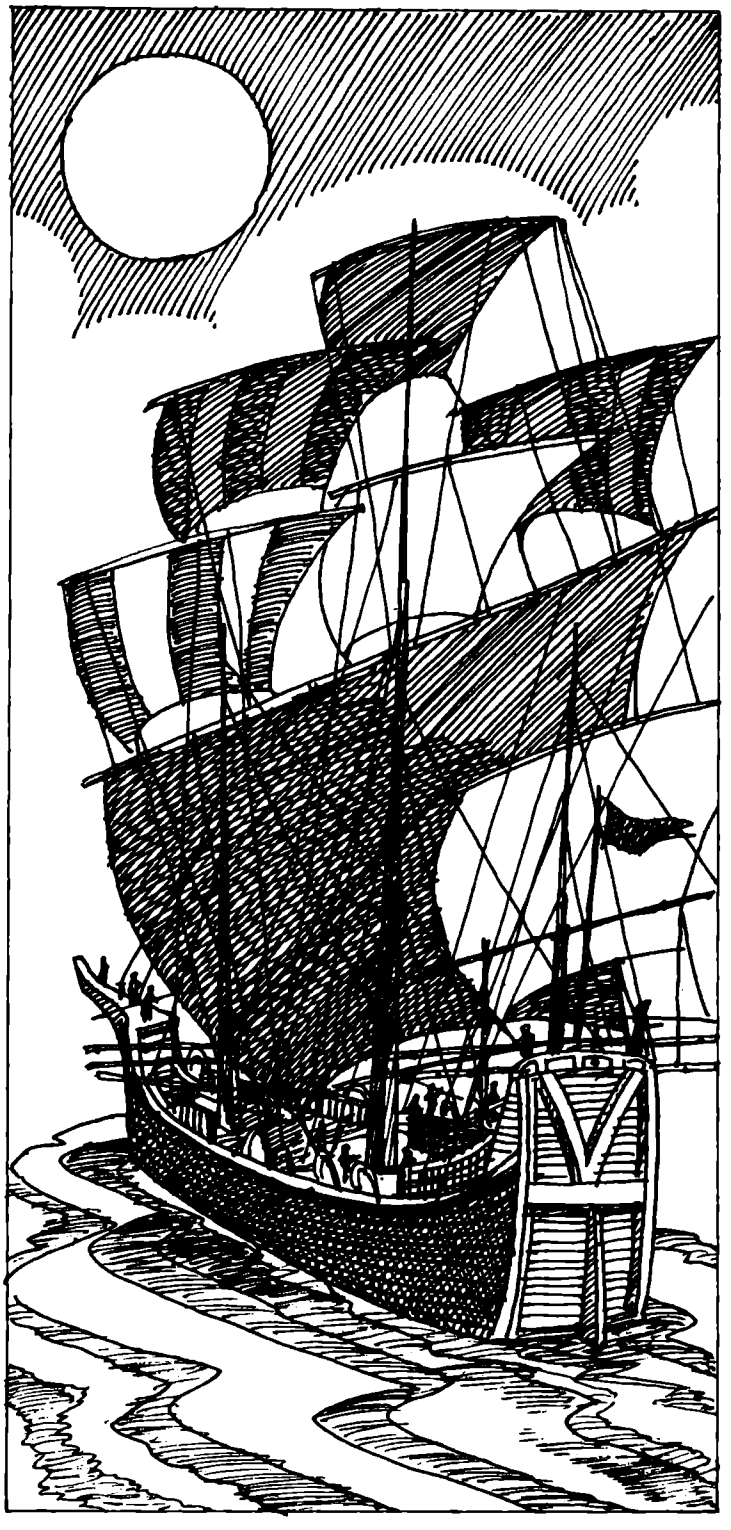

www.pathagar.com

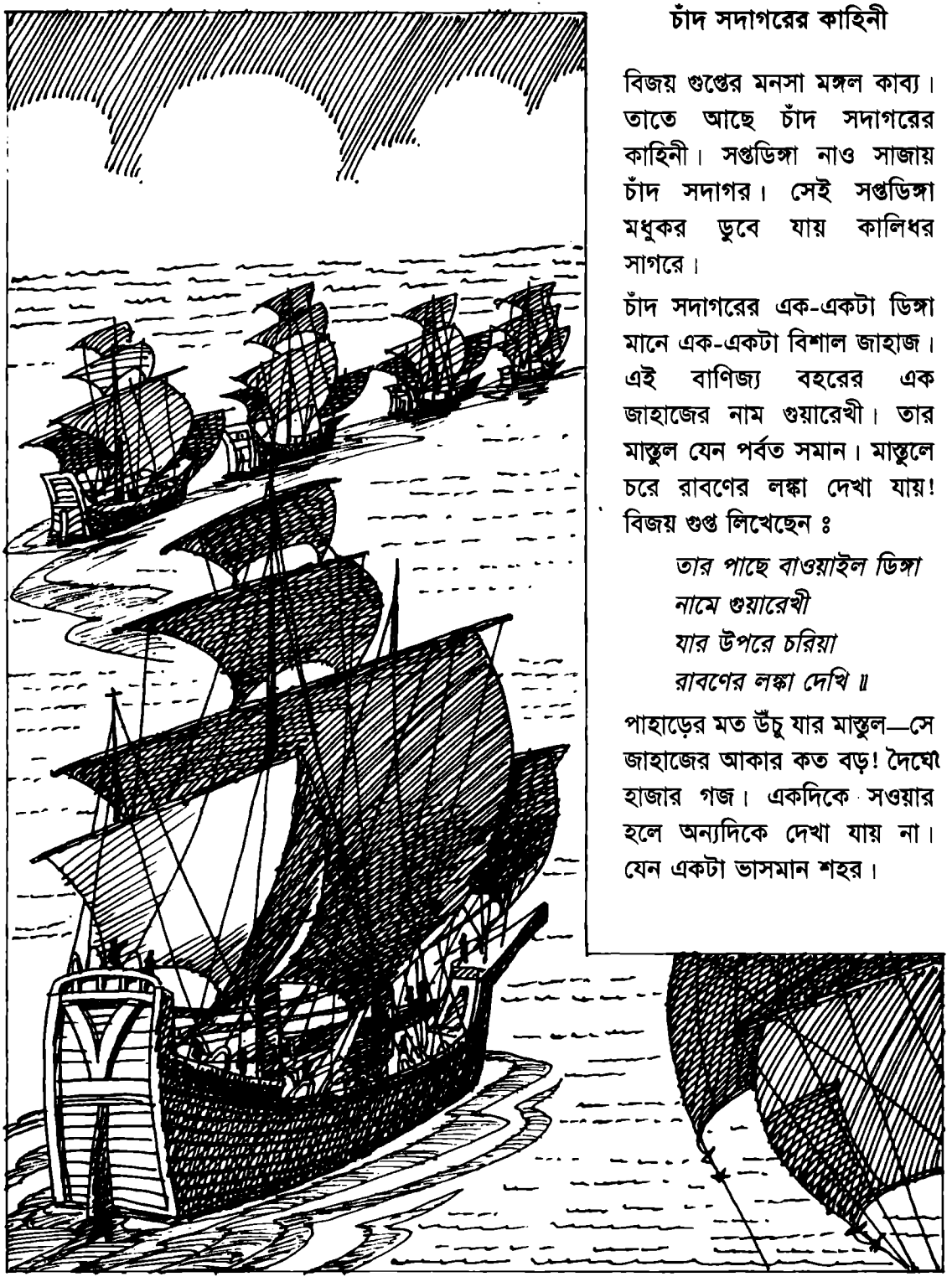

চাঁদ সদাগরের কাহিনী

বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্য। তাতে আছে চাঁদ সদাগরের কাহিনী। সপ্তডিঙ্গা নাও সাজায় চাঁদ সদাগর। সেই সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে যায় কালিধর সাগরে।

চাঁদ সদাগরের এক-একটা ডিঙ্গা মানে এক-একটা বিশাল জাহাজ। এই বাণিজ্য বহরের এক জাহাজের নাম গুয়ারেখী। তার মাস্তুল যেন পর্বত সমান। মাস্তুলে চরে রাবণের লঙ্কা দেখা যায়! বিজয় গুপ্ত লিখেছেন ঃ

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা
নামে গুয়ারেখী
যার উপরে চরিয়া
রাবণের লঙ্কা দেখি ॥

পাহাড়ের মত উঁচু যার মাস্তুল—সে জাহাজের আকার কত বড়! দৈর্ঘে হাজার গজ। একদিকে সওয়ার হলে অন্যদিকে দেখা যায় না। যেন একটা ভাসমান শহর।

www.pathagar.com

আগে চলে জলপলারী পাছে জলহার

নাম না জানা এক লেখকের 'পাঁচালী'। সে পাঁচালীতে আছে আমাদের পুরনো দিনের জাহাজ চলার রীতি। বিশাল জাহাজ। তার আগে পানি মেপে মেপে চলতো ছোট ছোট নৌকা। তার নাম ছিল 'জল পলারী' নাও।

বড় জাহাজ যাতে কোন চোরা দ্বীপে আটকে না পড়ে সে জন্য এই ব্যবস্থা। জল পলারীর পরে চলতো আরো একটি ছোট্ট নৌকা। পথ দেখাত সে। নাম তার 'জল হার'।

পাঁচালীতে সে কথাই বলা হয়েছে ঃ

আগে চলে জলপলারী
পাছে জলহার
সেই অনুসারে নৌকা
বাহে কর্ণধার।

আমাদের পাল তোলা জাহাজ চলতো সাগরের ঢেউ কেটে কেটে। ছন্দের তালে তালে। সে ছন্দ দোলা দিত জাহাজীদের মনে। মাঝি মাল্লা আর সওদাগরের বুকে।

আমাদের জাহাজের ছিল সুন্দর ছন্দময়, কাব্যিক নাম। পুরনো সাহিত্যের ধুসর পাতা থেকে জানা যায় সে সব নাম। মধুকর, ময়ূরপঙ্খী। রাজহংস, রাজবল্লভ, রত্নপতি। শঙ্খচূর, সমুদ্রফেন। উদয়তারা, কাজলরেখা। গুয়ারেখী, টিয়াঠুটি। বিজুসিজু, ভাড়ার পটুয়া। মিষ্টি মধুর সব নাম।

কোন কোন নাম থেকে সময় সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। গুয়ারেখী, টিয়াঠুটি, বিজু সিজু, ভাড়ার পটুয়া। এগুলো প্রাকৃত যুগের নাম। আমাদের নৌশিল্পের আরো প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী এসব শব্দ আর নৌকার বাহারী নাম।

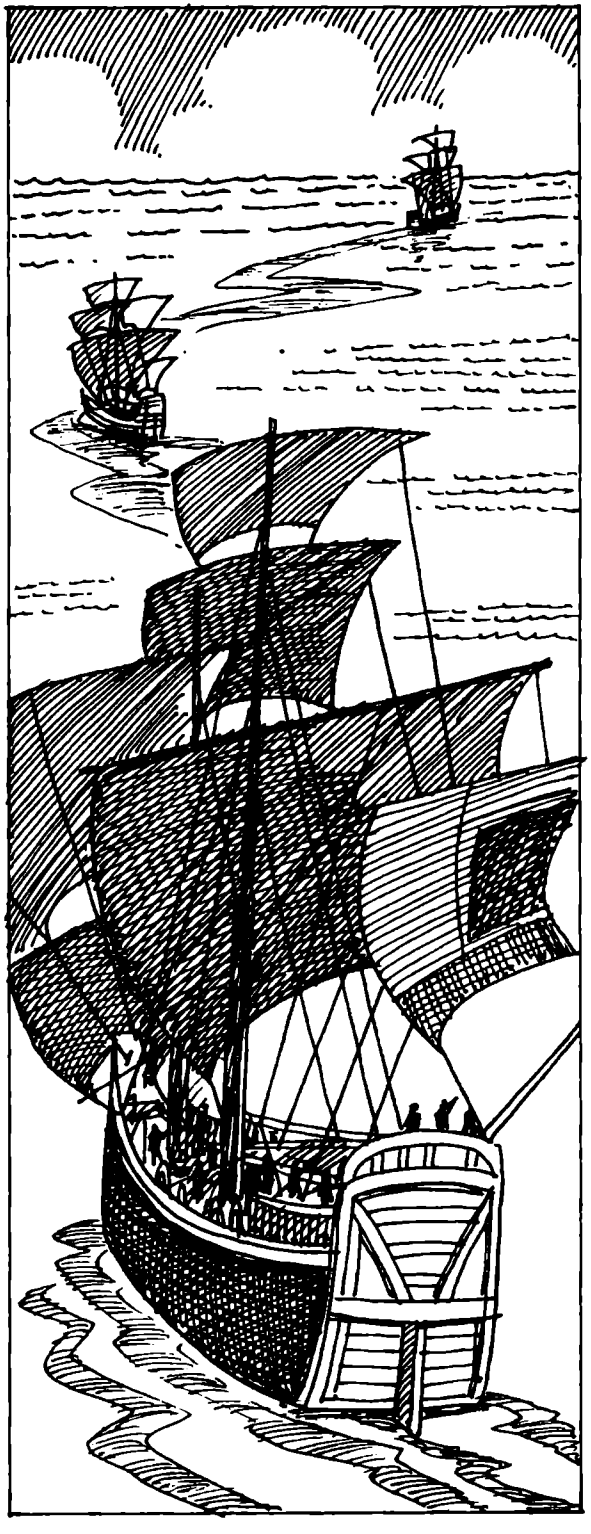

www.pathagar.com

দাঁড়াবিন্দা উৎসব

এক একটি নৌকা তৈরির পেছনে ছিল বিপুল আয়োজন। নৌকা তৈরি হতো উৎসবের মাধ্যমে। জাঁকজমকের সাথে। এমনি এক অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন মধ্যযুগের কবি বংশীদাস।

এখন যেমন আমাদের দেশে বড় ভবন, কারখানা বা ব্রীজ তৈরির আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সে যুগে নৌকার জন্য তেমনি ছিল 'দাঁড়াবিন্দা' অনুষ্ঠান। জাহাজের মালিক রূপার হাতুড়ি দিয়ে কাঠে সোনার পেরেক ঠুঁকে দিতেন। এভাবেই শুরু হতো জাহাজ তৈরির কাজ।

www.pathagar.com

যুদ্ধ জাহাজ ও নাওয়ারা বাহিনী

সওদাগরী জাহাজের মতই বিখ্যাত ছিল এদেশের যুদ্ধ জাহাজ। ভৌগোলিক কারণেই এ দেশের প্রতিরক্ষায় নৌ-জাহাজের গুরুত্ব সব সময় বেশী ছিল।

নদীমাতৃক দেশ আমাদের। নদ-নদীর গতিপথ যুগে যুগে এ দেশের সীমানা চিহ্নিত করেছে। এদেশ সোনার দেশ; চিত্তে-বিত্তে সমৃদ্ধ। তাই বিদেশী হামলা হতো। বেশির ভাগই নৌ পথে। আমাদের সীমানা পাহারা দিত আমাদের যুদ্ধ জাহাজ। পাল তোলা নাও।

তারপর বৌদ্ধ পালদের রাজত্ব। প্রায় চারশ' বছর স্থায়ী হয় পাল শাসন। সে আমলে গড়ে ওঠে পৃথক নৌ বিভাগ। বেড়ে ওঠে নৌ বাহিনী। তখন নৌ বাহিনী প্রধানের পদবী ছিল 'তারিক'।

পাল রাজত্বের পর বিদেশী সেন রাজাদের আমল। প্রাচীন তাম্রলিপি থেকে জানা যায় সে যুগের নৌ বাহিনীর কথা। সেনরা খুব অত্যাচারী ছিল। তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

সেনদের সংক্ষিপ্ত শাসনের পর এ দেশে চালু হয় মুসলিম শাসন। সদাগরী জাহাজ কিংবা যুদ্ধ জাহাজ— সব ধরনের নৌ শিল্পের উন্নতি হয় মুসলিম রাজত্বকালে। মুসলিম শাসন এদেশে নৌ শিল্পের সোনালী যুগ। এ সময় গড়ে ওঠে নৌশিল্পের নতুন ইতিহাস। সোনার হরফে লেখা সে কাহিনী।

সুলতানী আমলের কথা। সে আমলে নৌবহর বা নাওয়ারা বাহিনীর কদর বাড়ে। গড়ে ওঠে শক্তিশালী নৌ বাহিনী। নতুন নতুন জাহাজ তৈরি হয়। বিদেশী হামলা মুকাবিলা, দেশের ভিতরের বিদ্রোহ দমন। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রতিরোধ। এসব প্রয়োজনে গড়ে ওঠে নাওয়ারা বাহিনী।

আমাদের প্রাচীন রাজধানী কিংবা দুর্গ সবই গড়ে উঠেছিল নদীর ধারে। বুড়িগঙ্গার তীরে রাজধানী ঢাকা। ব্রহ্মপুত্রের তীরে এগারো সিন্দুর দুর্গ। যাতায়াতের সবচে' সুবিধা ছিল নৌ পথে তাই নদী তীরেই সব নগর-বন্দর।

দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক। তিনি দুবার বাংলাদেশ অভিযানে আসেন। একবার ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে, আরেকবার ১৩৬০ সালে। তার সাথে ছিল বিরাট সেনাবাহিনী। এই সৈন্যরা নৌকাযোগে নদী পার হয়ে এসে একডালা দুর্গ ও সোনারগাও আক্রমণ করেছিল।

www.pathagar.com

মানসিংহের জাহাজ ও কোষাকান্দা গ্রাম

বিখ্যাত বীর ঈসা খাঁ। বাংলার বারো ভুঁইয়াদের নেতা। তাঁর রাজধানী সোরাগাঁও। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা আর শীত লক্ষার মোহনায় অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জের অদূরে শীতলক্ষার তীরে তাঁর খিজিরপুর দুর্গ আর সুবিখ্যাত এগারো সিন্দুর। ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁষে দুর্গের অবস্থান।

নদীর অপর তীরে কাপাসিয়ার সুপ্রাচীন টোক বন্দর। কিশোরগঞ্জের এগারো সিন্দুর। অল্প দূরে কোষাকান্দা গ্রাম।

দিল্লীর সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ। তিনি ঈসা খাঁ'র বিরুদ্ধে অভিযান এসেছেন। যুদ্ধে মানসিংহের একটি 'কোষা' জাহাজ উল্টে যায়।

কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ও এগারোসিন্দুর-এর মধ্যবর্তী স্থানে উল্টে যাওয়া সেই কোষা জাহাজের ওপর মাটির স্তর জমা হয়। বহু দিন সেখানে ছিল বিরাট ঢিবি।

এখন সেখানে গড়ে উঠেছে গ্রাম। তবে কোষা উল্টে যাওয়ার সে স্থানে কোষার আকৃতিটি এখনো লোকে ধরে রেখেছে। আগ্রহীরা এখনো তা দেখতে যায়।

কোষা নামক সেই যুদ্ধ জাহাজ থেকেই আজ সেই গ্রামের নাম কোষাকান্দা। এসব আমাদেরই নৌবাহিনীর গৌরব-গাথা।

মোগল বাহিনীর সাথে ঈসা খাঁ'র যুদ্ধ। নৌপথেই ছিল সে যুদ্ধের অধিক বিস্তার। ঈসা খাঁ'র নেতৃত্বে বাংলার বারো ভুঁইয়ারা মোগলদেরকে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করেন।

ঈসা খাঁ'র মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খাঁ বাংলাদেশে অভিযান চালান। তার সাথে যুদ্ধ হয় ঈসা খাঁ'র পুত্র মুসা খাঁ'র। সেটিও ছিল ঘোরতর নৌযুদ্ধ। শীতলক্ষা নদীর বুকে।

www.pathagar.com

আড়াইহাজার নামের উৎপত্তি

নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজার থানা। বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত এক প্রাচীন জনপদ।

এক সময় এখানে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হয়েছিল। সেই মিলন মোহনায় আড়াইহাজার সৈন্যের ঘাঁটি বা দুর্গ ছিল ঈসা খাঁ'র। ছিল নিজস্ব শক্তিশালী নৌবহর। 'নাওয়ারা' বাহিনী। এই আড়াই হাজার নৌসেনা থেকেই জায়গার নাম হয়েছে 'আড়াইহাজার'।

আমাদের প্রাচীন নৌবাহিনী আর নৌ জাহাজের এমনি কত গৌরবময় স্মৃতি ছড়িয়ে আছে দেশের নানা জায়গায়।

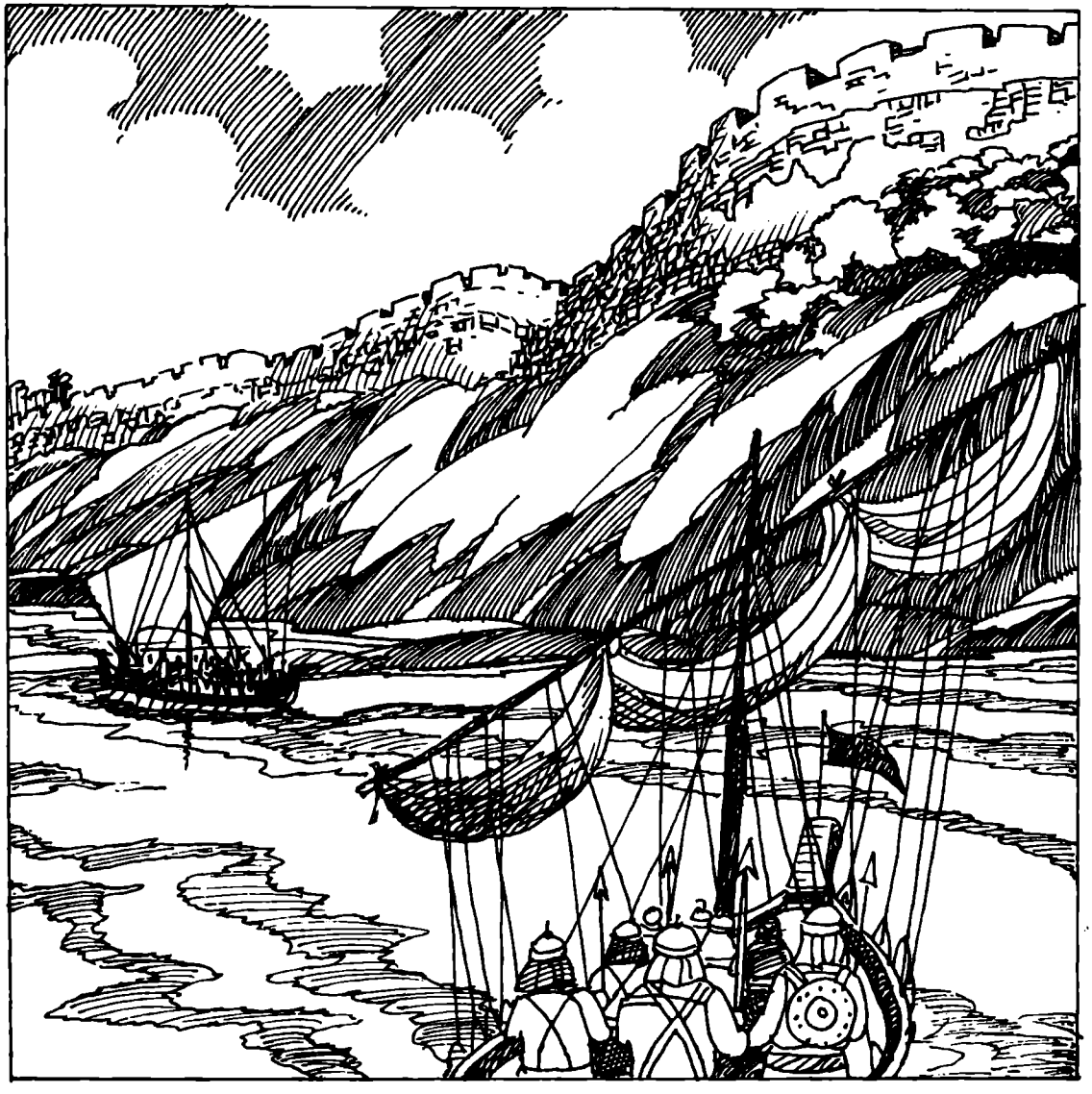

www.pathagar.com

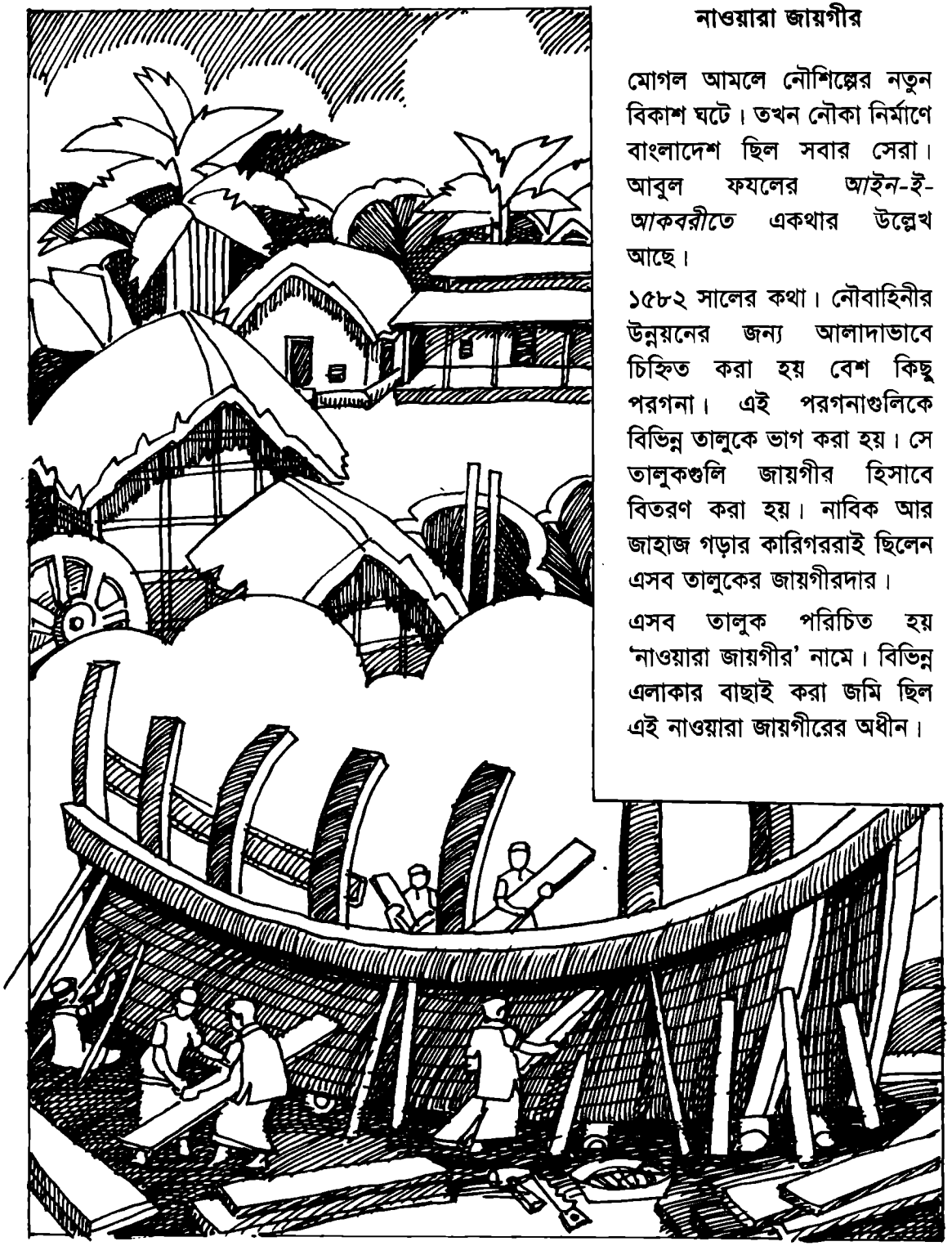

নাওয়ারা জায়গীর

মোগল আমলে নৌশিল্পের নতুন বিকাশ ঘটে। তখন নৌকা নির্মাণে বাংলাদেশ ছিল সবার সেরা। আবুল ফযলের *আইন-ই-আকবরীতে* একথার উল্লেখ আছে।

১৫৮২ সালের কথা। নৌবাহিনীর উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় বেশ কিছু পরগনা। এই পরগনাগুলিকে বিভিন্ন তালুকে ভাগ করা হয়। সে তালুকগুলি জায়গীর হিসাবে বিতরণ করা হয়। নাবিক আর জাহাজ গড়ার কারিগররাই ছিলেন এসব তালুকের জায়গীরদার।

এসব তালুক পরিচিত হয় 'নাওয়ারা জায়গীর' নামে। বিভিন্ন এলাকার বাছাই করা জমি ছিল এই নাওয়ারা জায়গীরের অধীন।

www.pathagar.com

জলদস্যুর মুকাবিলা

দেশে এক সময় জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে যায়। সুযোগ পেলেই হামলা চালাতো পর্তুগীজ আর আরাকানী জলদস্যুরা। তাদের হামলা ঠেকানোর জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনীর।

জনগণকে জলদস্যুদের হামলা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই রাজস্বের বিরাট অংশ ব্যয় করা হলো নৌ বহরের পিছনে।

নৌবাহিনীর ব্যয় বহনের আরো ব্যবস্থা ছিল। নাওয়ারা জায়গীর ছাড়াও ছিল বিশেষ ধরনের খাজনা বা কর। সেই করের নাম 'মীরবাড়ী'।

এই ট্যাক্স থেকে আসতো নৌ বহরের খরচ। আমাদের নৌ ঘাঁটিগুলিতে নোঙর করতো বাইরের অনেক জাহাজ ও নৌকা। তাদের কাছ থেকেও কর আদায় করা হতো। সে করের হার ছিল চার আনা, আট আনা ও এক টাকা। জাহাজের আকার অনুসারে এই হার নির্ধারিত হতো।

তখনকার বাজার দর অনুযায়ী চার আনা, আট আনা কম নয়। ফলে এই করের মাধ্যমে আয় হতো প্রচুর।

আমাদের দেশে নৌ বাহিনীর গুরুত্ব সবচে' বেশি বাড়ে মোগল আমলে। সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে নৌ শিল্পের সবচে' বেশি উন্নতি হয়।

মোগল আমলে ঢাকার নৌ বহরে জাহাজের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এ থেকে বোঝা যায় তখনকার নৌ বাহিনীর বিশালত্বের কথা। এই তিন হাজার জাহাজ তো ছিলই। এছাড়া যুদ্ধের সময় জায়গীরদারগণও রণতরী সরবরাহ করতেন।

www.pathagar.com

শায়েস্তা খাঁ'র যুদ্ধ জাহাজ

ইসলাম খাঁ চিশতী। মীর জুমলা। শায়েস্তা খাঁ। মোগল আমলের বিখ্যাত তিন সুবাদার। বাংলাদেশে নৌবহর গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের খ্যাতি সবার ওপরে।

শায়েস্তা খাঁ'র নৌবহর গড়ে তোলার বিবরণ লিখেছেন শিহাবুদ্দীন তালিশ। এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ফারসী ভাষায় লেখা তার বই থেকে জানা যায় শায়েস্তা খাঁ'র অনেক কীর্তির কথা।

জাহাজ তৈরি আর মেরামতের কারিগর দেশের যেখানে যত পাওয়া যায়, সবাইকে শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় ডেকে আনেন। দেশের সকল স্থান থেকে জাহাজের জন্য ভালো কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেন তিনি।

ঢাকার জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে তিনি কর্মব্যস্ত করে তোলেন। সৃষ্টি করেন নতুন প্রেরণা। হুগলী, বালাসোর, মুরাং, চিলমারী, যশোর, করিবাড়ী। জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল এসব গুরুত্বপূর্ণ নৌ বন্দর। শায়েস্তা খাঁ এসব বন্দরেও হুকুম জারি করেন—বেশি বেশি নৌযান তৈরি করে ঢাকায় পাঠানোর জন্য।

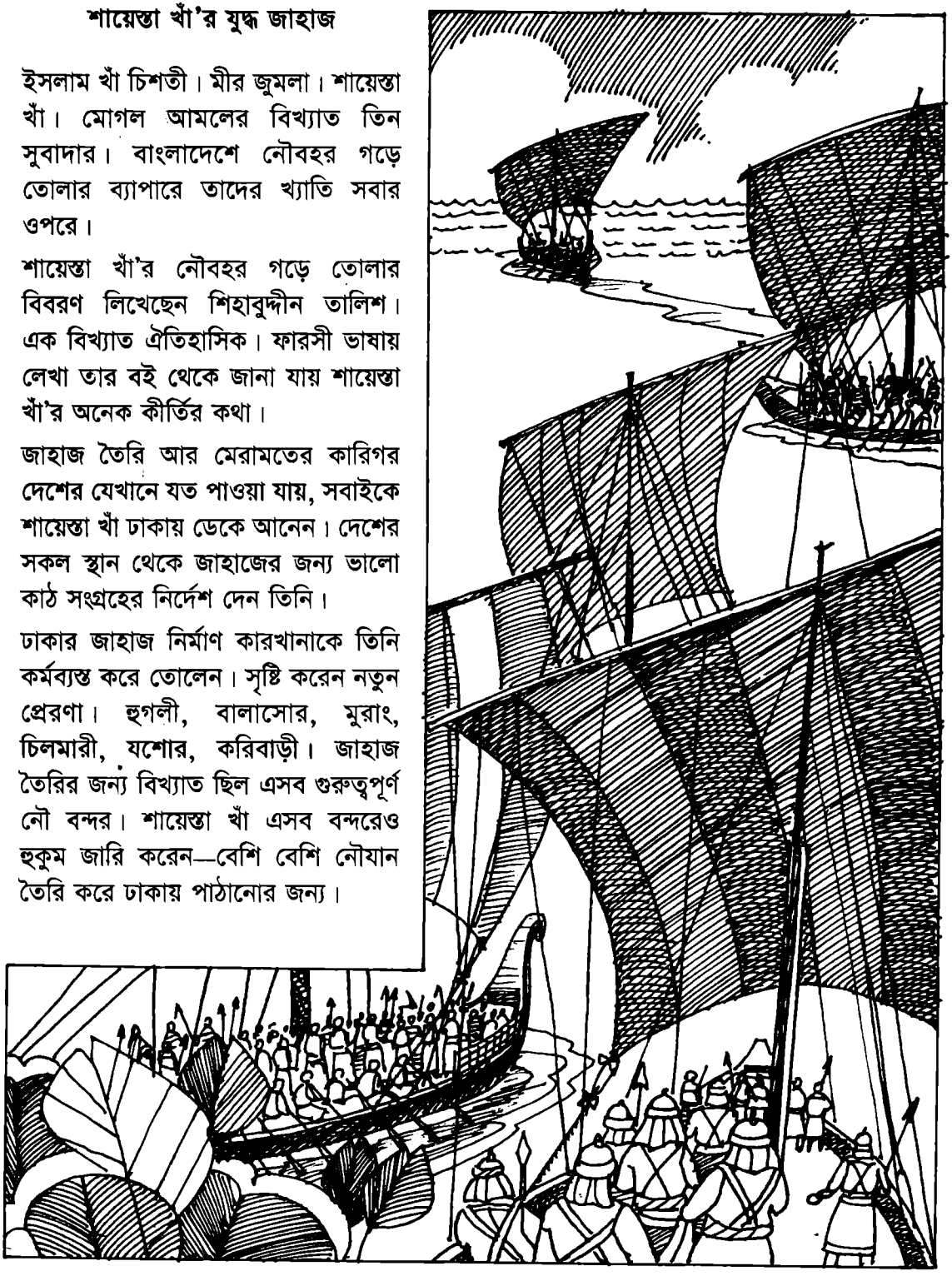

www.pathagar.com

তিনশ' যুদ্ধ জাহাজ

নৌবহর সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য শায়েস্তা খাঁ তাঁর সকল শক্তি কাজে লাগান। নাবিকদেরকে তিনি সংগঠিত করেন। তাদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করেন।

জাহাজ তৈরির জন্য প্রয়োজন নানা রসদ। সেই সাথে দরকার দক্ষ কারিগর। সবকিছুর দিকেই নযর ছিল শায়েস্তা খাঁ'র। নৌবহর গড়ে তোলা ছিল তার বিরাট সাধনা। শায়েস্তা খাঁ এক মুহূর্তও ভুলতেন না তার স্বপ্নের কথা।

হাকিম মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন একজন মনসবদার। মোগল বাহিনীর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ ; বিশ্বস্ত। শায়েস্তা খাঁ তাকেই জাহাজ নির্মাণ বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন।

নৌ বিভাগের প্রতিটি পদে নিয়োগ করা হয় বাছাই করা কর্মচারী। শায়েস্তা খাঁ'র চেষ্টা ও পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তৈরি হয় বিরাট আকারের তিনশ' যুদ্ধ জাহাজ। প্রতিটি জাহাজ ছিল উপযুক্ত যুদ্ধ সাজে সজ্জিত।

www.pathagar.com

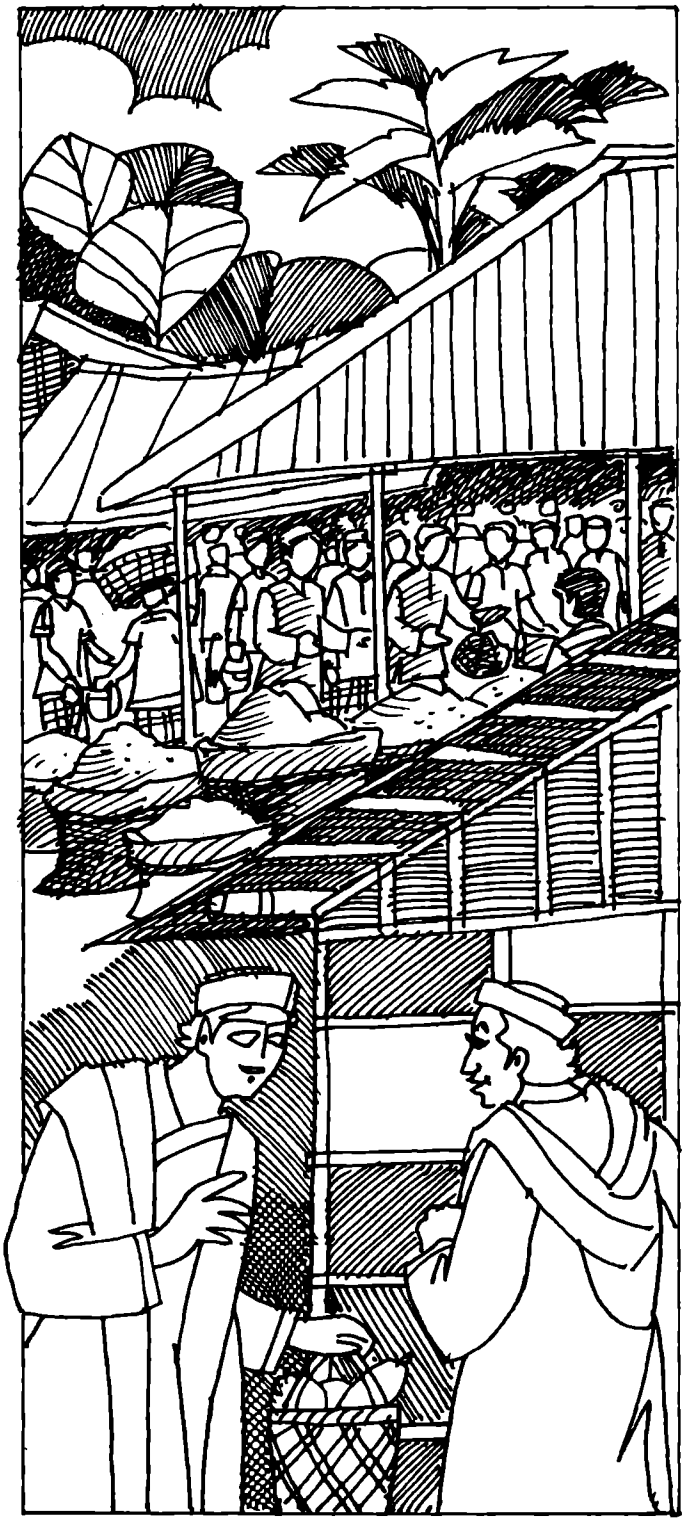

টাকায় আট মণ চাল

দেশীয় সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ। কিংবা মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলা। শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে এসব সফলভাবেই মোকাবিলা করেন শায়েস্তা খাঁ। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও বঙ্গোপসাগরে বহু নৌযুদ্ধ হয়। সব যুদ্ধে শায়েস্তা খাঁ'র বাহিনী সাফল্যের পরিচয় দেয়।

শায়েস্তা খাঁ দেশে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। শায়েস্তা খাঁ'র আমলে মানুষ সবদিক থেকেই শান্তিতে বাস করতো। জিনিস-পত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। তখন এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আর জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য ছিল কম। ফলে দেশের মানুষ ছিল সুখী। এর পেছনেও বড় অবদান ছিল নৌকা ও জাহাজের। শায়েস্তা খাঁ'র জাহাজগুলির আকার কেমন ছিল ? সে সম্পর্কেও লিখেছেন শিহাবুদ্দীন তালিশ।

সবচে' বড় জাহাজের নাম ছিল সলব। তারপর ঘ্রাব, জলবা, কোশ। এছাড়া ছিল খালু ও ধুম। শায়েস্তা খাঁ'র নৌবহরের সবচে' ছোট জাহাজটিও ছিল 'বিশাল রণতরী'। এ থেকে বোঝা যায় বড়গুলি কত প্রকাণ্ড ছিল।

চট্টগ্রামের নৌযুদ্ধে এসব রণতরী ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের জাহাজ ব্যবহার হতো। সে সব জাহাজের মধ্যে ছিল জঙ্গী, বাচারী ও পারেন্দা।

www.pathagar.com

মীর জুমলার রণতরী

মোগল সুবাদার মীর জুমলার নৌ বাহিনীতেও ছিল অনেক জাহাজ। কোশ, জলবা, জেলিয়া, ঘ্রাব, পারেন্দা, বজরা। সলব, ভূরা, পাতেলা। বহর, বালাম, পাতিল। রথগিরি, মহালগিরি, পালওয়ার। আরও কত নামের রণতরী।

ইংরেজ পর্যটক বাউরির কাছে আমরা জেনেছি, 'পাতেলা' নামক পণ্যবাহী জাহাজ চার থেকে ছয় হাজার মণ মাল বহন করতো। আরো বড় জাহাজগুলোর আয়তন এ থেকে আন্দায করা যায়।

পর্তুগীজ নৌবহরেও ছিল বিভিন্ন রকম জাহাজ। ফাস্তেজ, কার্তুজ, বার্কেন ইত্যাদি। এছাড়া দেশীয় রাজাদের বহরেও এ ধরনের রণতরী ছিল।

'রিয়াজুস সালাতিন' এক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। গোলাম হোসেন সলিম ১৭৮৮ সালে লিখেছেন এ বই। সেখানে আছে উঁচু গলুইওয়ালা এক প্রকার রণতরীর কথা। এই গলুই দুর্গের প্রাচীর থেকেও উঁচু ছিল। ফলে যুদ্ধের সময় প্রাচীর ভেদ করা সহজ হতো।

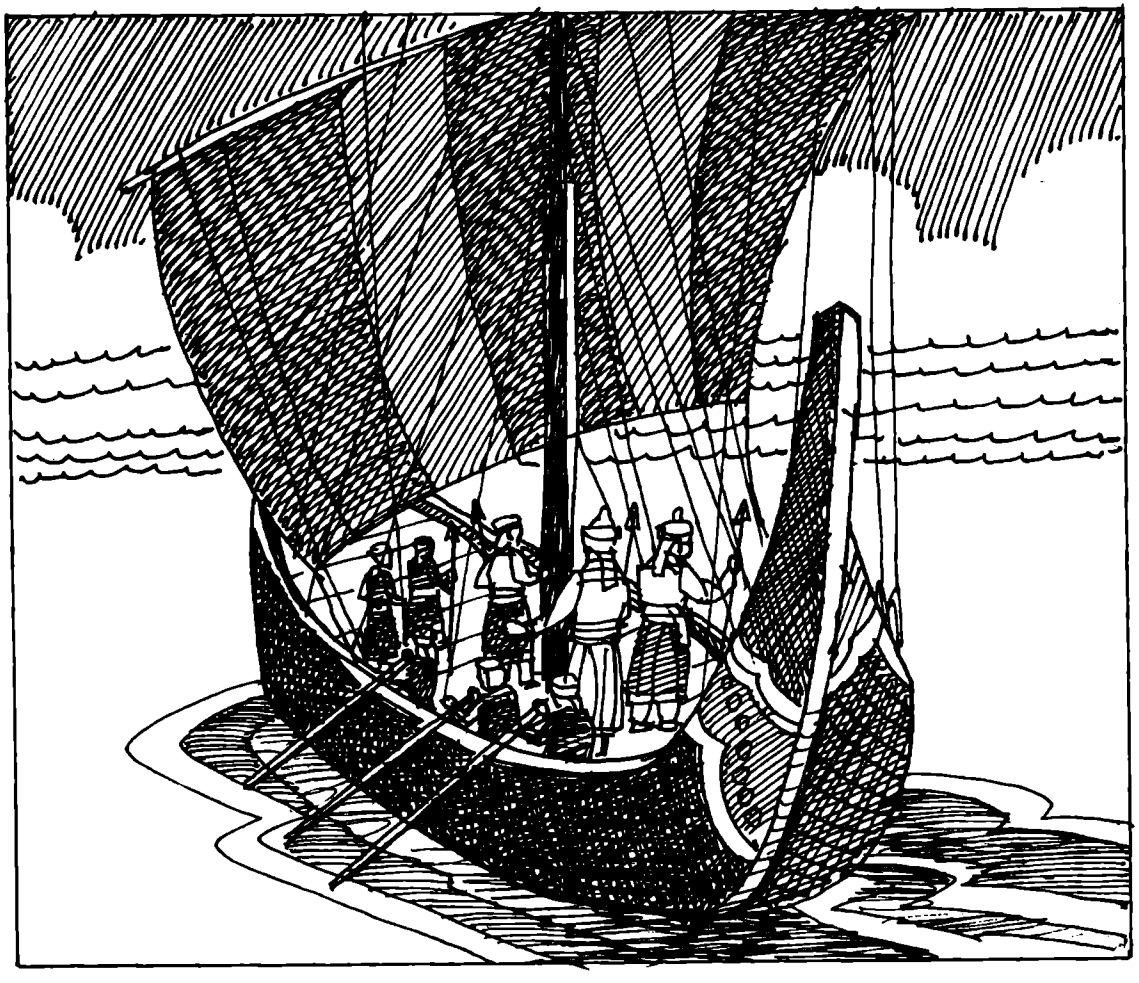

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে তুমি এসেছ দরিয়া কত ···

আমরা জানলাম আমাদের হরেক রকম নাওয়ের কাহিনী। শুনলাম নাওয়ের সোনালী দিনের কথা। আমাদের নাওয়ের শত হাজার বছরের ইতিহাস। সোনার হরফে লেখা সে ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি পাতা।

ডোঙ্গা আর ভেলা দিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর বিরাট বিরাট পাল তোলা নাও। তৈরি হয়েছে টাইটানিকের মতো বিশাল জাহাজ। আমাদের পাল তোলা জাহাজ পাড়ি দিয়েছে এক সাগর থেকে আরেক সাগরে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে।

হাজার হাজার মণ সওদা নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছে আমাদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর। ময়ুরপঙ্খী। সমুদ্র ফেন। কাজল রেখা। গুয়ারেখী। ভাড়ার পটুয়া।

পাহাড় সমান ঢেউয়ের তালে নৃত্য করেছে আমাদের পাল তোলা নাও। শক্ত হাতে হাল ধরেছে আমাদের সিন্দাবাদ নাবিক। আমীর সওদাগর। আর নছর মালুম।

আমাদের নাওয়ের ইতিহাস দীর্ঘ। সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে জীবনের নোনা স্বাদ। আমাদের মাঝি-মাল্লাদের শক্তি আর সাহসের কাহিনী। সেই দুরন্ত মাঝি-মাল্লাদের কথা লিখেছেন কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'-তে।

পাড়ি দিয়ে তুমি এসেছ দরিয়া কত,
কিশতীর মুখ বাঁচায়ে এনেছ
বহু টাইফুন যুঝি',
ছিঁড়ে গেছে শিরা, উড়ে গেছে এক হাত;
আর হাতে তুমি হাল ঘোরায়েছ
তুফানের সাথে যুঝি'!
দরিয়ার মাঝি! তোমার ওজুদে
পাথর গলানো খাঁক!
পাথর পারানো কুঅত তোমারে
দিয়াছে আল্লা পাক!

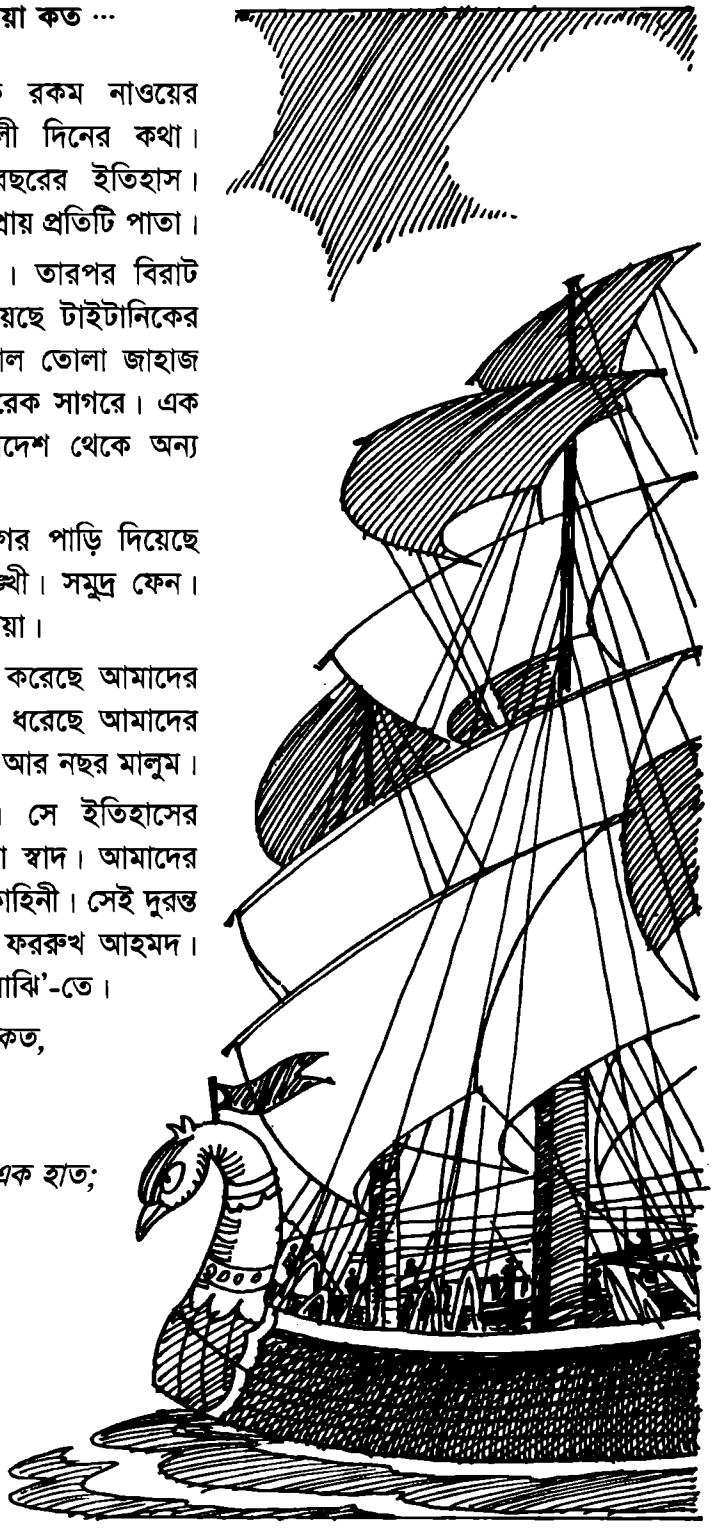

www.pathagar.com

তারপর ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গেল আমাদের গৌরবের নৌকা। সাত সাগরের সিন্দাবাদ নাবিক সাগর ভুলে কূয়ার ব্যাঙে পরিণত হলো। লবঙ্গ ফুল, এলাচের সুবাস আর হাতীর দাঁতের সওদা ফেলে আমীর সদাগর হলেন আদার ব্যাপারী।

কে ছিনিয়ে নিল আমাদের নৌকার বাহাদুরী? কে কেড়ে নিল আমাদের হাজার মাল্লার সদাগরী? সোনার দেশের সাহসী ছেলেদের বুক থেকে সাগরের নেশা কেড়ে নিল কোন্ হার্মাদ? কেমন করে আমরা এমন বদ্‌লে গেলাম? বড়ই করুণ সে কাহিনী।

www.pathagar.com

ইংরেজ এলো বণিক সেজে

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভেক ধরে ইংরেজ আমাদের দেশে এলো বাণিজ্য করতে। এই দুষ্ট ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে নিল। ষড়যন্ত্রের দ্বারা। সে এক কূটিল ইতিহাস।

উমিচাঁদ আর জগৎশেঠরা জোট বাঁধলো ইংরেজদের সাথে। তারা দলে ভিড়ালো সেনাপতি মীর জাফর আলী খানকে। সবাই মিলে দেশটা তুলে দিল বিদেশীদের হাতে। শহীদ হল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদৌলা। সেটা ১৭৫৭ সালের কথা।

ইংরেজরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিল। দেশের সওদাগররা ধ্বংস হলো। ধ্বংস হলো অর্থনীতি, মূল্যবোধ, প্রেম-ভালোবাসা, সম্প্রীতি আর সম্মানবোধ। সেই সাথে ধ্বংস হলো আমাদের নৌকা আর নৌ-শিল্প। ইংরেজ শাসনের শুরুর দিনগুলোতেও আমাদের দেশে কিছু জাহাজ ছিল। সে কথা লিখেছেন ইংরেজ লেখক কেরী। ১৭৮০ সালে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়। খাদ্যের অভাবে তখন মারা যায় বহু লোক। সেখানে খাদ্য পাঠাতে হতো। তখন সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অনেক জাহাজ তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

রেনেলের বিবরণ

সিলেটের কালেক্টার ছিলেন লিণ্ডসে নামক একজন ইংরেজ। তিনি সিলেট থেকে কুড়িটি জাহাজ বোঝাই করে চাল পাঠান মাদ্রাজে। এই নৌবহরের একেকটি জাহাজে চাল ছিল চারশ টন। মানে, বারো হাজার মণ।

১৭৮৮ সালের কথা। তখনো বাংলাদেশের নৌশিল্পে নিয়োজিত ছিল তিরিশ হাজার কারিগর। লিখেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমি জরিপ কর্মকর্তা জেমস রেনেল।

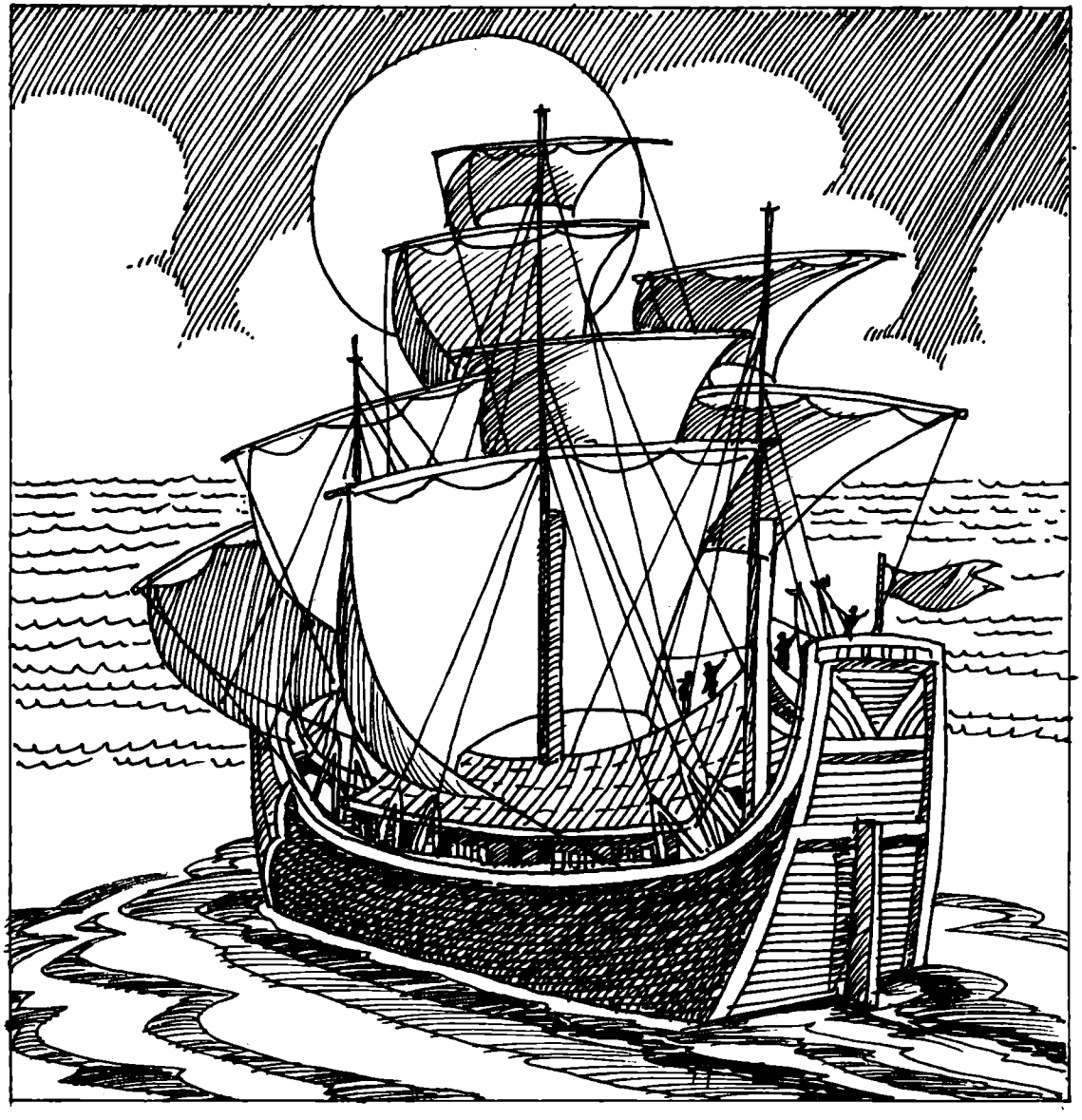

www.pathagar.com

কালো দিনের ফরমান

১৭৮৯ সাল। তারিখ ১৪ই জানুয়ারি। আমাদের নাওয়ের ইতিহাসের কালো দিবস। এই তারিখে ইংরেজ সরকার একটি ফরমান জারী করলো। তারা আইন করে দিল, বড় নৌকা তৈরি করা চলবে না।

দশটির বেশি দাঁড় আছে যে নৌকায়। চাঁদপুরের সেই 'পঞ্চ ওয়েস' নৌকা তৈরি নিষিদ্ধ হলো।

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাত লম্বা। আড়াই থেকে চার হাত চওড়া। নাম তার 'লুখা' নৌকা। সে নৌকা তৈরিও বন্ধ করা হলো।

তিরিশ থেকে সত্তুর হাত লম্বা। তিন থেকে পাঁচ হাত চওড়া জেলিয়া নৌকা। তার বিরুদ্ধেও একই হুকুম।

আইন করা হলো ঃ এসব নৌকা কোথাও দেখা গেলে ইংরেজ সরকার সেগুলো দখল করে নেবে।

আরো বলা হলো ঃ কোন জমিদার তার এলাকায় ইংরেজ সরকারের লিখিত আদেশ ছাড়া নৌযান তৈরি করতে পারবে না। মেরামত করতে পারবে না। হুকুম অমান্য করলে নৌকা ইংরেজ সরকার দখল করে নিতে পারবে।

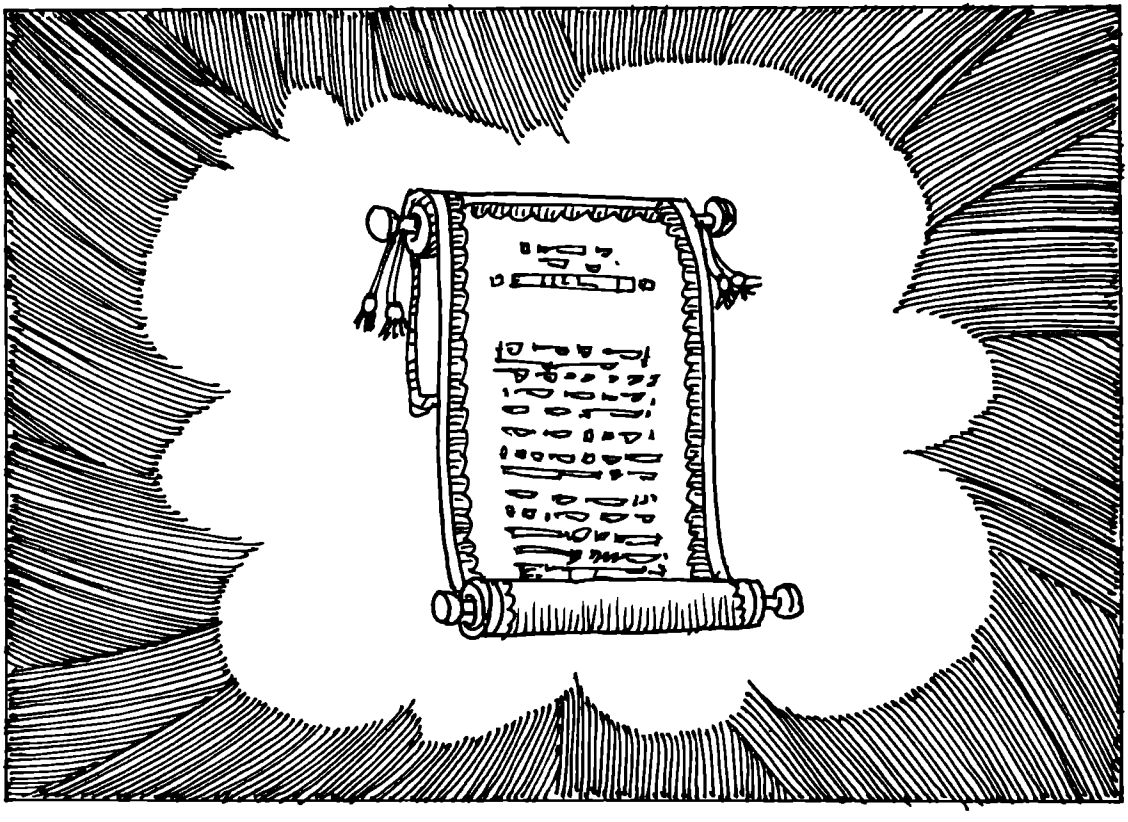

www.pathagar.com

ত্রিশ ঘা বেত

নৌকার ব্যাপারে ইংরেজদের মনে ছিল ভয় ও আশংকা। তারা ভেবেছে, এসব নৌকার মাঝি-মাল্লারা সুযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

এদেশের মানুষকে ইংরেজরা বিশ্বাস করতো না।

নৌকা ছিল এদেশের শক্তি ; সাহস। তাই নৌকার ব্যাপারে তাদের ভয়। জোর করে যারা অন্যের দেশ দখল করে তারা এমনই করে। ইংরেজরা আমাদের নৌ-শিল্পীদেরকে ভয় দেখাল। হুকুম ছাড়া কেউ নৌযান তৈরি বা মেরামত করলে শাস্তি হবে। এক মাসের জেল। কিংবা কুড়ি ঘা বেতের আঘাত। নৌকার কারিগররা কাজ হারাল ; পথও হারাল।

পরাধীন দেশে কোন কিছুরই স্বাধীনতা নেই। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে আমাদের নৌশিল্পের এ ভাবেই সর্বনাশ হলো। সাত সাগরের ওপার থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল ইংরেজ। তারা ধ্বংস করলো আমাদের নৌকার গৌরব।

www.pathagar.com

ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হলো আমাদের সাগরের বাণিজ্য। ঘরের কোণে মুখ থুবড়ে পড়লো সিন্দাবাদ নাবিক। সয়ফল মুলুক। আমীর সওদাগর। চাঁদ সওদাগর। নছর মালুম।

সাত সাগরের মাঝিরা সবাই সাগর থেকে কূয়ায় নির্বাসিত হলেন।

আমাদের সপ্তডিঙ্গা মধুকরের দিন শেষ হলো। ময়ূরপঙ্খী, সমুদ্রফেন। উদয়তারা, রত্নপতি। শঙ্খচূড়, কাজলরেখা। বালাম, গোধা, জঙ্গী। কোন্দা, বাছারী, সুলুপ। জলবা, কোশ, ঘ্রাব। পারেন্দা, পাতেলা। বজরা, ভূরা, বহর। রথগিরি, মহালগিরি। টিয়াঠুটি, বিজুসিজু। রাজহংস, রাজ বল্লভ আর পালওয়ার।

এসব জাহাজের বদলে এরপর শুধুই তৈরি হতে থাকলো ছোট ছোট নাও। এক মাল্লা, কোষা বা ডিঙ্গি যার নাম।

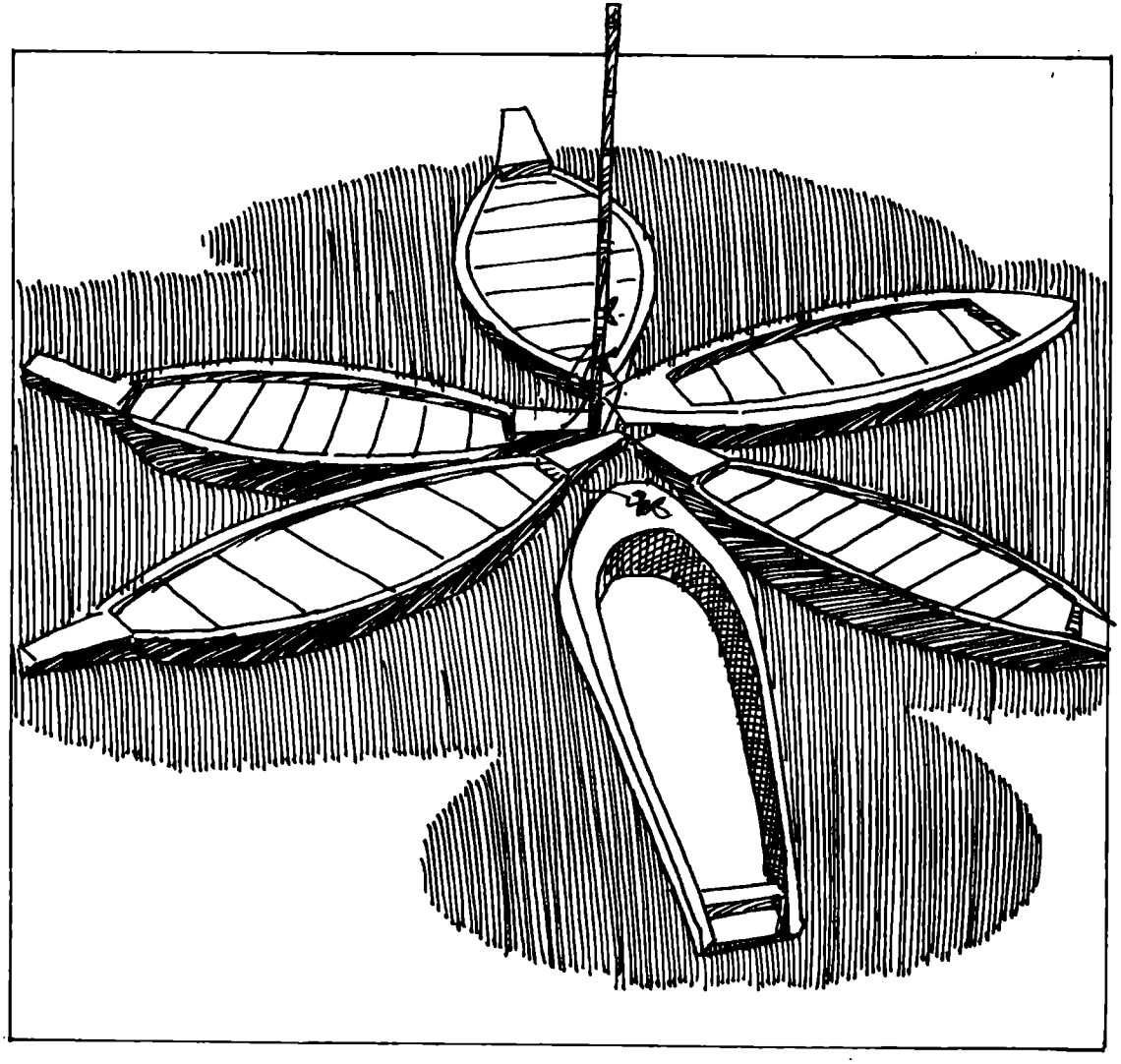

www.pathagar.com

ছিপ-খান তিন দাঁড়

নৌকা, কোষা, ভাওয়ালী। ছিপ, ডিঙ্গি, জেলে ডিঙ্গি। পটল, পানসী, ঘাষী। গেরদারী, কুমারিয়া, পানুয়া। গয়না, নাওধুরী, ডোঙ্গা। খেলনা আর সাম্পান।

তিনশ' মাল্লার বিরাট পাল তোলা জাহাজে হাল ধরতো যে দুরন্ত নাবিক— সে এখন পিঠ বাঁকা করে গুণ টানতে শুরু করলো কাশবনের ধার ঘেঁষে।

আমাদের সাহিত্যে গুয়ারেখীর কথা আর থাকলো না। আমাদের সিন্দাবাদ নাবিক, আমীর সওদাগর আর নছর মালুম হলেন ডিঙি নৌকার মাঝি।

ছিপ খান তিন দাঁড়
তিন জন মাল্লা
চৌপর দিন ভর
দেয় দূর পাল্লা।

আমাদের নৌ শিল্পের পরিণতি হলো এই !

www.pathagar.com

তারপরও পাল ওড়ে

তারপরও আমাদের জীবনের বিরাট অংশ জুড়ে থাকলো নাওয়ের প্রভাব। আমাদের মালামাল কিংবা মানুষ। এক স্থান থেকে অন্যখানে বয়ে নিতে লাগে নাও।

আজো দেশের হাট-বাজার, শহর-গঞ্জ কিংবা শিল্প গড়ে ওঠে নদীর ধারে। নৌকায় করে মালামাল বয়ে নেয়া সহজ। এ জন্যই নদীর পাড়ে সব আয়োজন।

পালের নাওয়ের পাশাপাশি অনেক আগেই এদেশে চালু হয়েছে কলের জাহাজ। গড়ে উঠেছে লঞ্চ আর স্টীমার তৈরির কারখানা। ঢাকার জাহাজ শিল্পের ঐতিহ্যের রেশ ধরে নারায়ণগঞ্জের ডকইয়ার্ডে এখন বড় বড় জাহাজ তৈরি হয়; মেরামত হয়। রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে সদরঘাটের অপর পাড়ে গড়ে উঠেছে জাহাজ নির্মাণ শিল্প। দেশী কারিগররা আলিশান সব জাহাজ তৈরি করছেন। নদী খননের জন্য ভারি ড্রেজারও তারা তৈরি করতে সক্ষম। তবু কিন্তু নৌপথের আশি ভাগ মাল এখনো বয়ে নেয় পাল তোলা নাও।

নাও ছাইড়া দে
পাল উড়াইয়া দে
ছলছলাইয়া চলুক নৌকা
মাঝ দইরাতে।

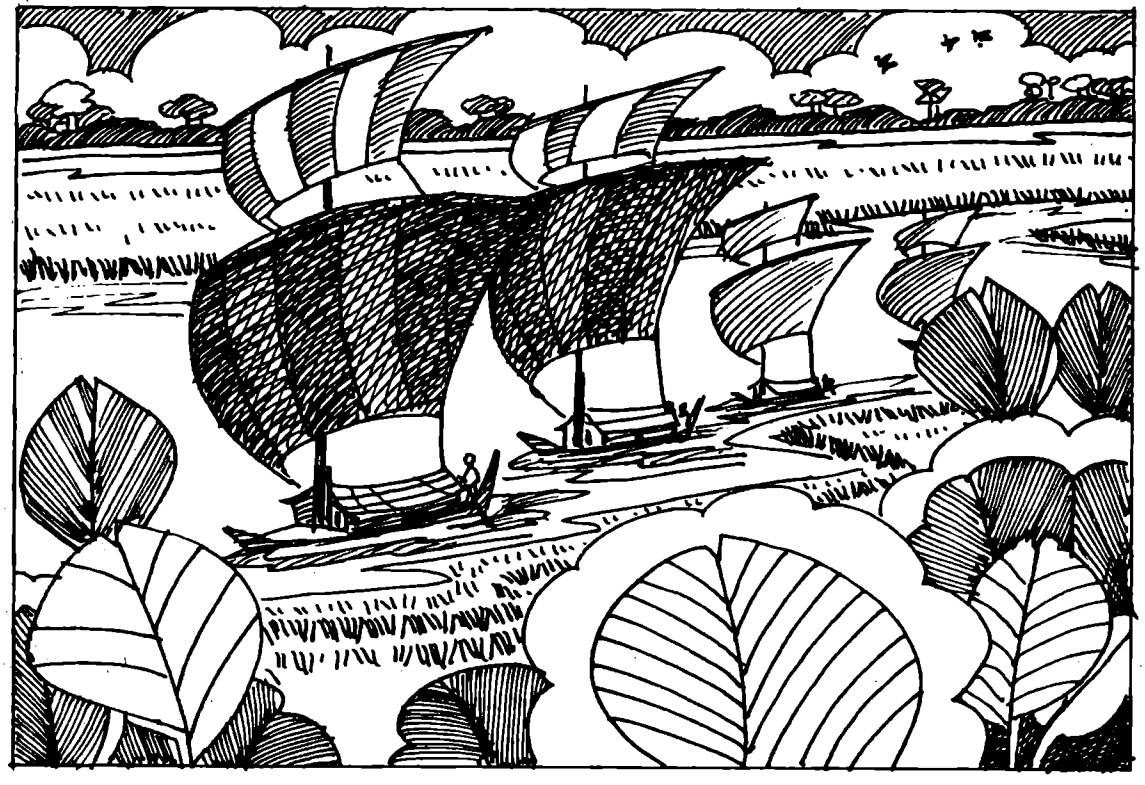

www.pathagar.com

কত নাও, কত বাও

আমাদের দেশে এখন কত নৌকা আছে ? ১৯৫৮ সালে একবার হিসাব হয়েছিল। আমাদের নাওয়ের সংখ্যা ছিল তখন এক লাখ তেরো হাজার চারশ' তেত্রিশ।

এদেশের প্রায় সত্তর হাজার নাও ভাড়ায় মাল বয়। এক বছরে এসব নৌকা বয়ে নেয় এক কোটি তিরিশ লাখ মণ শস্য। দেড়শ' থেকে পনেরো শ' মণ মাল নেয়ার মতো নৌকা আছে এদেশে তিরিশ হাজার।

দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথেই চলে এসব নাও। বর্ষাকালে এই নৌপথের বিস্তার প্রায় আট হাজার মাইল।

বর্ষায় ডুবে যায় এ দেশের পথ-ঘাট-মাঠ। বিরাট অঞ্চল। নৌকা তখন চলাচলের প্রধান বাহন। নৌপথই তখন হয়ে ওঠে রাজপথ। সিরাতুল মুস্তাকিম।

www.pathagar.com

আলকরন ও সুলুক বহরের কথা

আমাদের নৌকার দেহে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। একেকটির একেক নাম। আগের দিনে হাইলকে বলা হতো দাঁড় বা পাটওয়াল। মাস্তুলকে বলা হতো মালুম কাষ্ঠ। ছইকে বলা হতো ছইঘর। এছাড়াও পাল, দাঁড়, নোঙ্গর, তলা। এসব নাম চালু আছে অনেক আগ থেকে। হাজার বছর পাড়ি দিয়ে এসব শব্দ আজো মানুষের মুখে মুখে চালু।

নাওয়ের ঐতিহ্যের সাথে আমাদের ভাষায় চালু হয়েছে অনেক বিদেশী শব্দ। মাস্তুল, ডাবু, তুরুব। কাবিস্তান, গারাবীল। সুলুব, বাহরা, মৌজ্জা। দৈবান, সর, লশকর। খালাসী, সারেং।

এসব শব্দ আমাদের নৌ চলাচলের নিজস্ব ভাষা।

চট্টগ্রামে এসব শব্দের চল সবচে' বেশি। আরবী মু'আল্লিম শব্দ পাল্টে মালুম হয়েছে। সুক্কান হয়েছে সুয়ান বা সুকানী। আরবী জলীবুত থেকে আমরা নেমেছি জালীবোটে। এমনি আরো কত শব্দ!

এসব বিদেশী শব্দ নৌশিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের ভাষায় মিশে গেছে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষার শব্দও এসেছে আমাদের ভাষায়। সেগুলোও নাও বেয়ে ভিড়েছে আমাদের বন্দরে। যেমন, সাম্পান এসেছে বার্মার থাম্মান থেকে।

www.pathagar.com

নাও-নদী-জীবন

নৌকার সাথে জড়িয়ে আছেন অসংখ্য মাঝি-মাল্লা-জেলে। আর নৌকার কারিগর। এছাড়া আছেন আরেক দল মানুষ। নায়ে যাদের বসতি। নৌকাই যাদের একমাত্র ঠিকানা। নৌকা আর নদীকে কেন্দ্র করে বেদে আর বেদেনীর বিচিত্র সংসার।

নৌকা আর মানুষ। কখনো কখনো এক দেহ, একপ্রাণ। দার্শনিক বা ভাবুকদের চোখে মানুষের দেহটাও একটা নৌকা। মানুষের জীবন যেন এক বহমান নদীর উপমা।

জীবন নামক এই নদীতে নাও ভাসায় মন নামক মাঝি। নাও বাইতে বাইতে কখনো সে গেয়ে ওঠে ঃ

মন মাঝি তোর বৈঠা নে-রে
আমি আর বাইতে পারলাম না...।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খুব ভোরে আব্বা-আম্মা কোরআন তিলাওয়াত করেন। তাঁদের সুরেলা আওয়াজে ঘুম ভাঙে অনেকের। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতেই চোখ পড়ে রেহেলের ওপর। তাতে সুন্দর, পবিত্র একখানা বই। আল-কোরআন। আল্লাহর বাণী। সুন্দর কাগজে চমৎকার ছাপা এই কোরআন।

ছোটমনিদের অনেকেরই ভোরের সবক শুরু হয় কোরআন শরীফ হাতে। যারা বেশী ছোট তাদের হাতে কায়দা।

তারপর ছবির বই। ছড়ার বই। গল্পের বই। ছবি, ছড়া আর গল্প। কত অজানা কথা আর কাহিনী।

দেশের কথা। বিদেশের কথা। জ্ঞানের কথা। বিজ্ঞানের কথা। মজার মজার বই। সব কাগজে লেখা।

সকালে হকার খবরের কাগজ দিয়ে যায়। নানা রকম খবর থাকে তাতে। দেশ-বিদেশের খবর। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটলো। সে সব তাজা খবর। নিত্য দিনের খবর। খবরের কাগজ পড়ে আমরা জানতে পারি সব।

কাগজ যদি না থাকতো। বই হতো কেমন করে? কিভাবে পেতাম কোরআন শরীফ ? কাগজই যদি নেই, কোথায় মিলতো খবরের কাগজ ? কাগজ নেই—এ কথা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে, তাই না!

www.pathagar.com

যখন কাগজ ছিল না

এক সময় সত্যি কিন্তু কাগজ ছিল না। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। কাগজ ছিল না। তাই বই-খাতা আর খবরের কাগজও ছিল না। খুব বেশি দরকারী কথাগুলো তখন লিখে রাখা হতো পাথরে কিংবা মাটির ফলকে। চামড়ায় কিংবা গাছের ছালে। কিংবা তালের পাতায়।

সেটা ছিল খুব কঠিন কাজ। সে কাজে সময় লাগতো অনেক। কষ্ট হতো বেশি। আর তাতে বেশি কিছু লেখাও যেতো না।
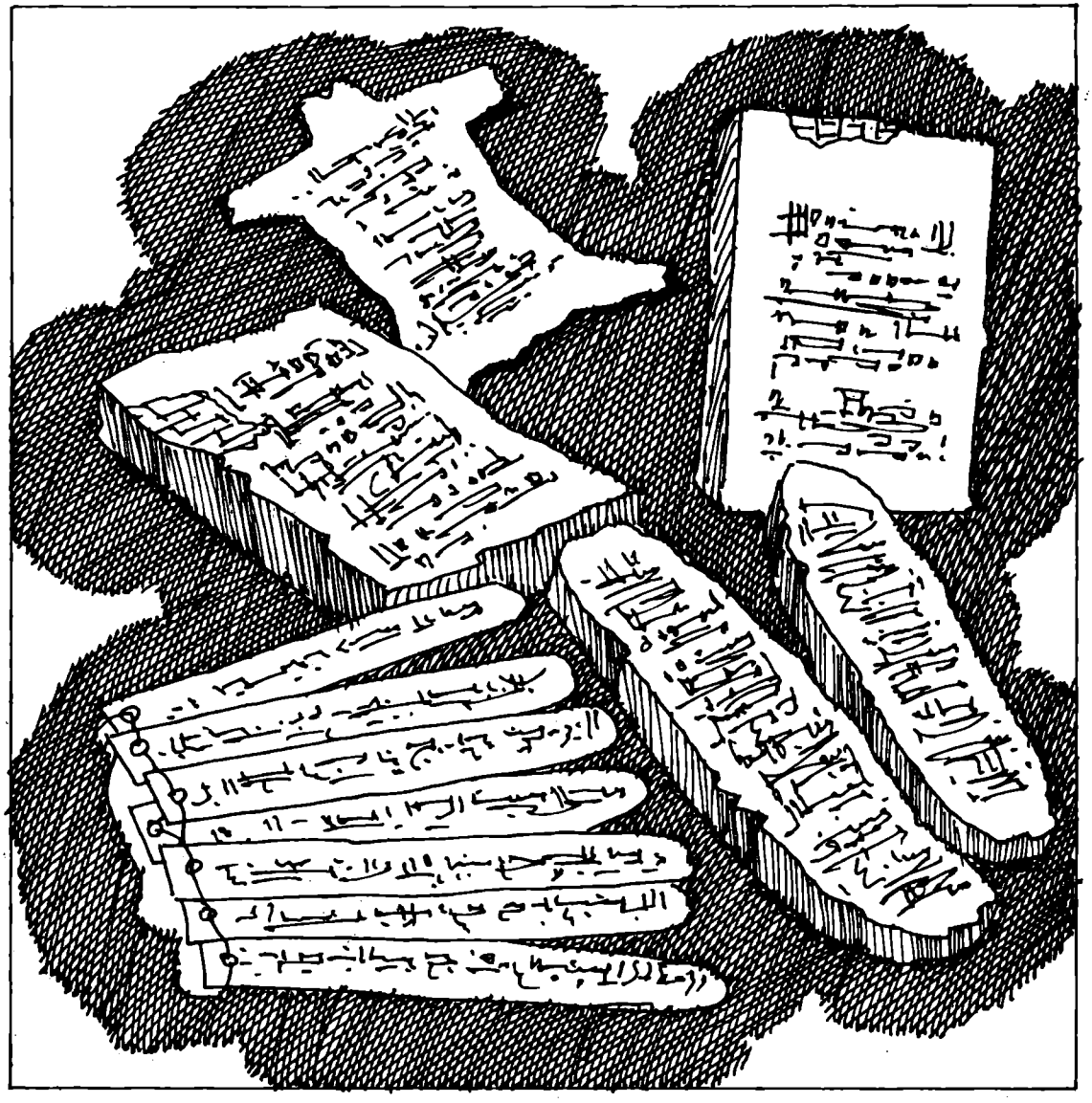
www.pathagar.com

কাগজের কত গুণ

কাগজ আবিষ্কারের পর এখন অনেক সুবিধা। পড়া কিংবা লেখা। জানা এবং শিখা। সবকিছু সহজ এখন। কাগজ ব্যবহার শুরু হবার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে অনেক। কাগজে কিছু লেখার পর সহজে তা মুছে যায় না। কাগজ ব্যবহার করা সহজ। অনেক কাগজ একসাথে বেঁধে বই বানানো যায়। এ সবই কাগজের গুণ।

www.pathagar.com

কাগজ পেলাম কেমন করে

কাগজ কখন, কোথায় প্রথম তৈরি হলো? তারপর এই কাগজের সাথে সবাইকে কারা পরিচিত করালেন? আমাদের দেশে প্রথম কাগজ তৈরি শুরু হলো কেমন করে? জানতে ইচ্ছে করে না সে সব চমক লাগানো কথা?

চলো—শুনি।

www.pathagar.com

চীন দেশের কাগজ

অনেকের মতে, কাগজ প্রথম তৈরি হয় চীন দেশে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মেরও দু'শ বছর আগে।

চীন দেশে তখন কাগজ তৈরি হতো। কিন্তু অন্য দেশের লোকেরা এর খবর জানত না। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার তো তেমন উন্নতি হয়নি, তাই।

সে সময় উড়োজাহাজ ছিল না। রেলগাড়ী ছিল না। ট্যাক্সি কিংবা মোটর গাড়ী ছিল না। ছিল না লঞ্চ-স্টীমার। টেলিফোন কিংবা রেডিও-টিভি তো ছিলই না। এক দেশের মানুষ অন্য দেশ সম্পর্কে জানবে কেমন করে?

চীন দেশের কাগজের কথা তাই ভীন্‌দেশের লোকেরা জানতে পারেনি অনেক দিন।

www.pathagar.com

তারপর একদিন পালতোলা জাহাজে করে এক দল লোক আসলেন চীনে। আরব দেশের লোক তারা। আমাদের নবীর সাহাবী তারা।

সেই দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)। তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামা।

ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া পাল তোলা দু'খানি জাহাজ নিয়ে রওনা হন তাঁরা। বাংলাদেশ হয়ে তাঁরা চীনে পৌঁছেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) চীনের ক্যান্টনে ইন্তেকাল করেন। এখনো সেখানে তাঁর কবর এবং একটি বিখ্যাত মসজিদ রয়েছে।

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে শুরু। তারপর চীনে গমন করেন আরো অনেক ইসলাম প্রচারক। এই মুসলমানরাই প্রথম পরিচিত হন চীন দেশের কাগজের সাথে।

চীনে তাঁরা ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের ডাকে সাড়া দেন বহু লোক। ঈমান আনেন আল্লাহর প্রতি।

এই নও-মুসলিমদের কাছে আরবরা শিখলেন কাগজ তৈরির কৌশল। সেই চমৎকার অভিজ্ঞতা তাঁরা নিয়ে এলেন চীনের বাইরে। এভাবেই কাগজ পরিচিত হয় চীন দেশের বাইরে। ইসলাম প্রচারক মুসলমানরাই চীনের বাইরে কাগজ তৈরির প্রথম কারিগর।

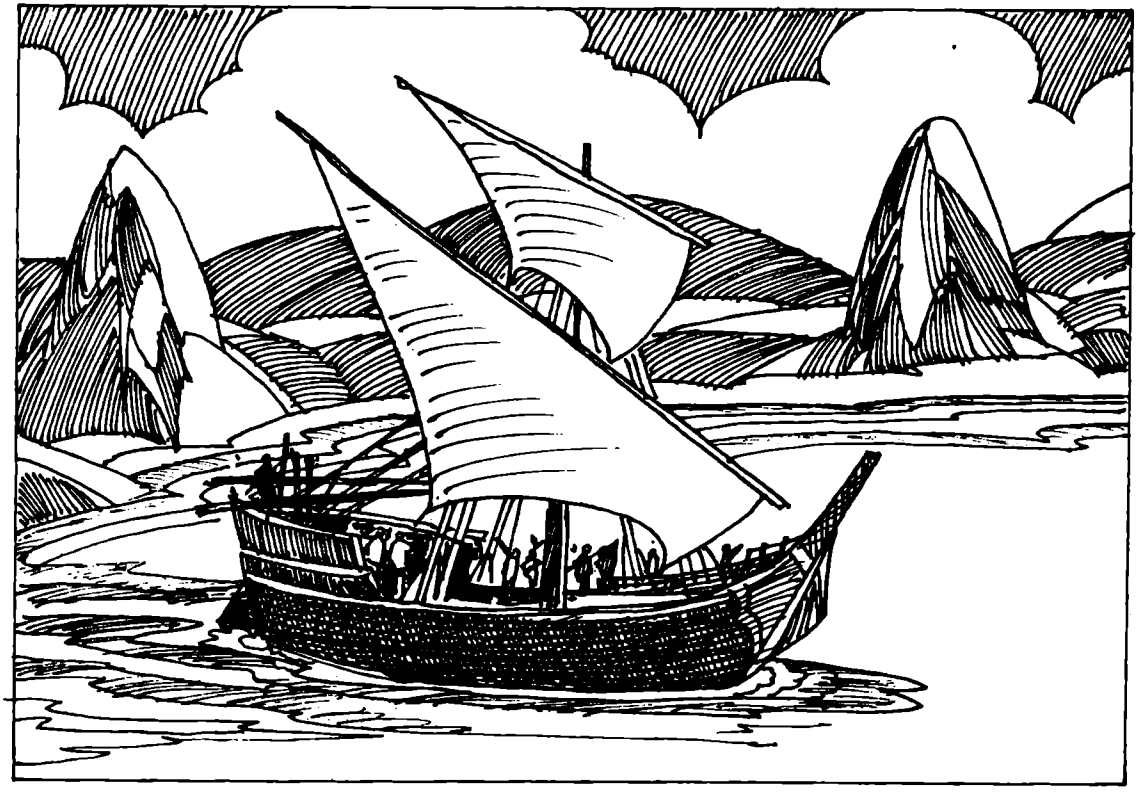

www.pathagar.com

কাগজ গেলো সমরকন্দে

সমরকন্দ এক প্রাচীন এলাকা। গৌরবময় ভূমি। এখানে ইসলামী শাসন কায়েম হয় ৭০৪ খৃষ্টাব্দে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের মাত্র ৭২ বছর পরেই।

সমরকন্দে ইসলামের প্রবেশ ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে চালু হলো কাগজ তৈরির কারখানা। চীনের বাইরে এটিই কাগজের প্রথম কারখানা। এখান থেকেই আরো অনেক দেশে কাগজ শিল্পের বিস্তার ঘটে।

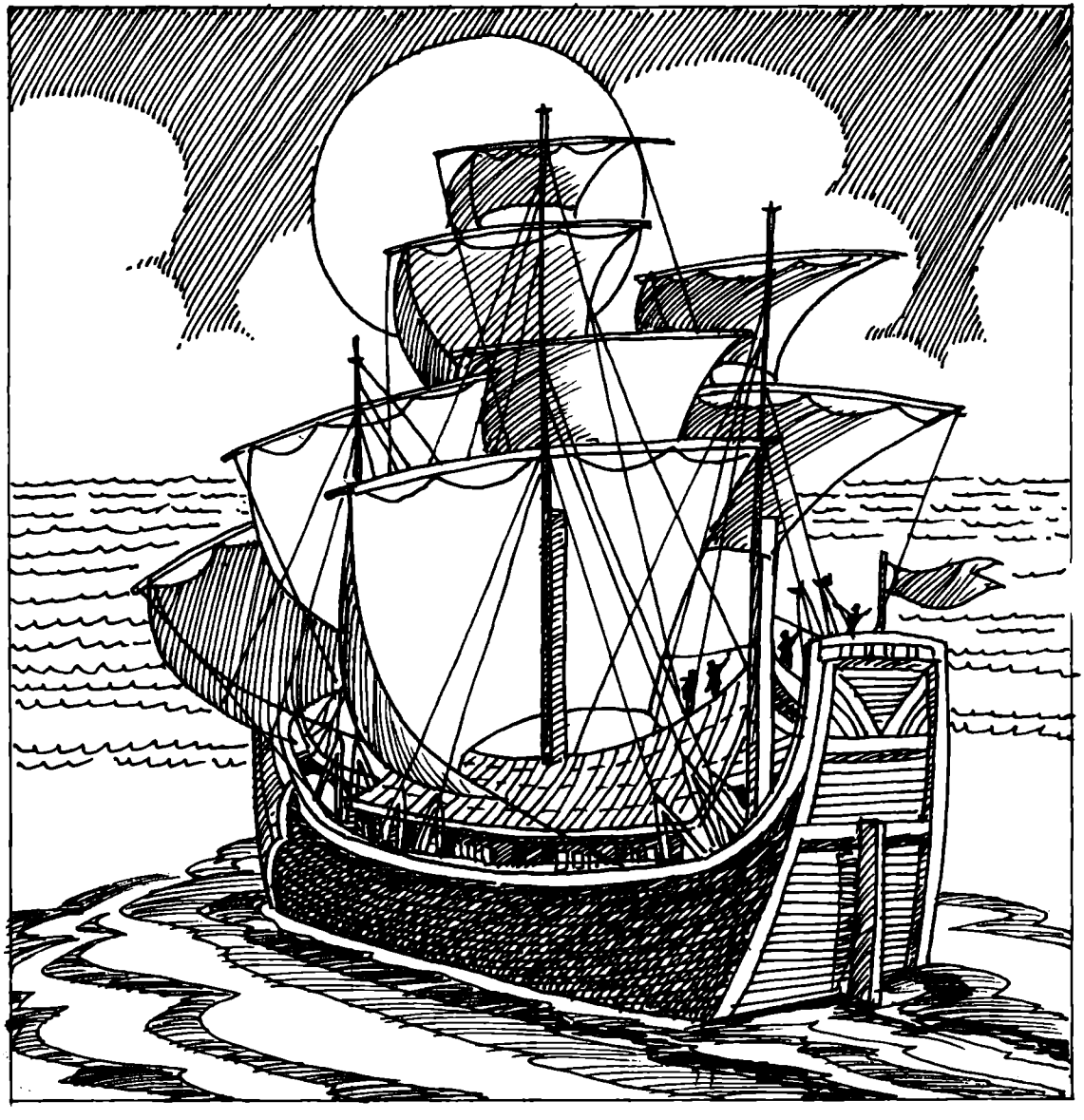

www.pathagar.com

ইসলামের বিজয়-যুগের কথা বলছি। ইসলামের বিজয় মানেই ছিল শিক্ষা আর সভ্যতার বিজয়। ইসলাম যেন সূর্যের মতো। সূর্য উঠার সাথে সাথে রাতের আঁধার দূর হয়। ইসলাম যেখানে গেছে, সেখানে আঁধার কেটে ফুটে উঠেছে শিক্ষা আর সভ্যতার আলো।

মুসলিম শাসনের কারণেই সমরকন্দ পেল কাগজ তৈরীর কারখানা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হলো সমরকন্দ। সমরকন্দ হলো ইসলামের জ্ঞান কেন্দ্র।

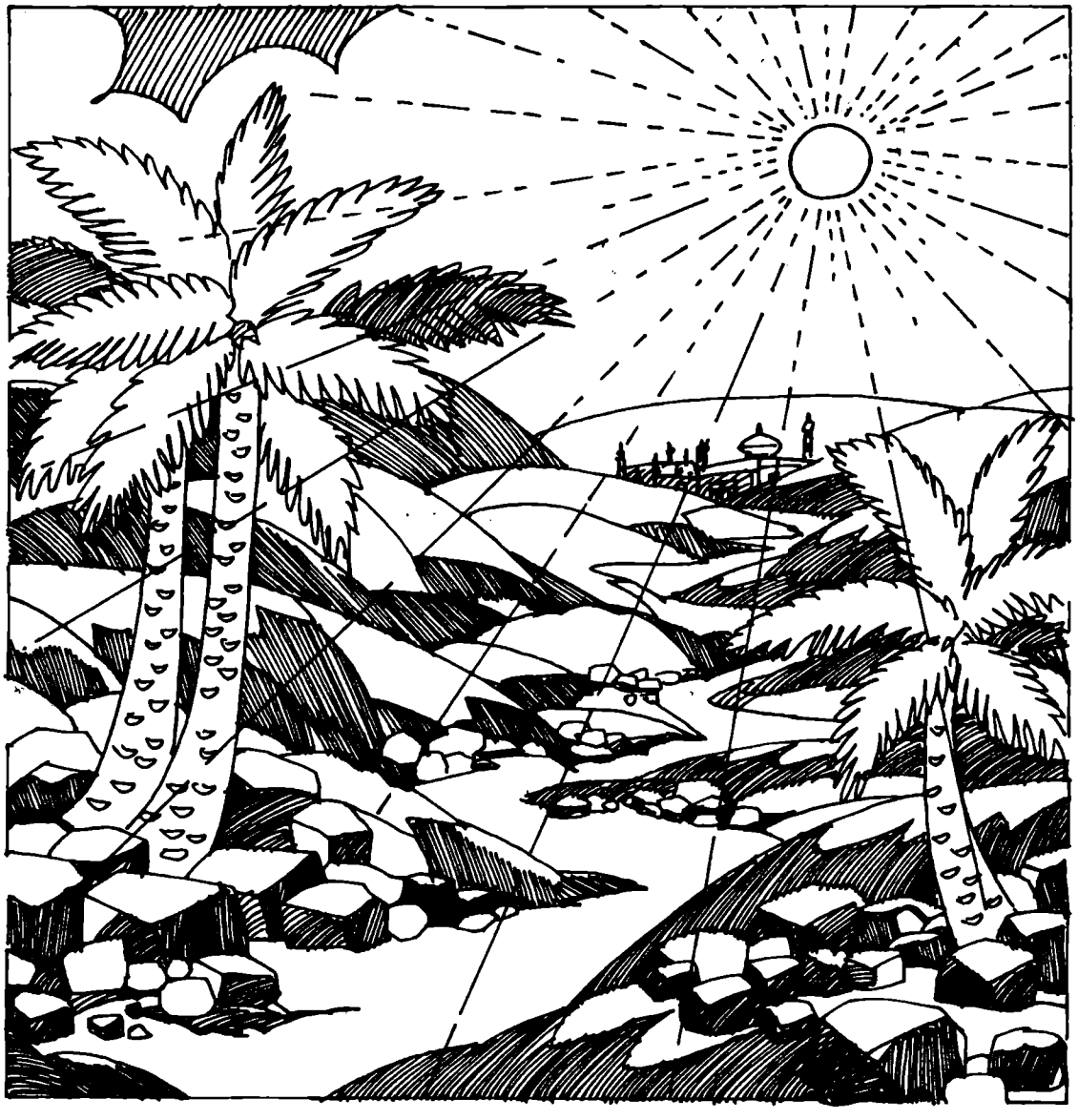

www.pathagar.com

কাগজে লেখা পুরনো বই

কাগজের ব্যাপক ব্যবহার আরবেই প্রথম শুরু হয়। তার মধ্যে সবার উপরে বাগদাদের নাম। ইসলামের প্রথম চার খলীফা—খোলাফায়ে রাশেদীন। তাঁদের পর বাগদাদ ছিল মুসলমানদের রাজধানী। মুসলিম শাসনকেন্দ্র। মুসলমানরা বাগদাদে গড়ে তোলেন 'বায়তুল হিকমাহ'। এর ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র হলো বাগদাদ। বাগদাদ নগরীতে কাগজের প্রথম কারখানা চালু হয় আজ থেকে প্রায় বারো শ' বছর আগে। ৭৯৪ সালে।

বিশ্ববিখ্যাত লীডেন লাইব্রেরীতে একটি পুরনো বই আছে। কাগজে লেখা পৃথিবীর সবচে' পুরনো বইগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আরবী ভাষায় লেখা এই বই। বইটির নাম 'গারীবুল হাদীস'। লেখা হয় আজ থেকে সোয়া এগারো শ' বছর আগে। ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। কাগজের আধুনিক ব্যবহারে মুসলমানরা ছিল অগ্রগামী জাতি। এ প্রাচীনতম বই তার প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইউরোপ যখন কাগজের নাম জানতো না

আজকের ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত উন্নত! আমাদের দেশ থেকেও অনেকে এখন ইউরোপে যায় উচ্চ শিক্ষার জন্য। এই ইউরোপের লোকেরা এক সময় কাগজের ব্যবহার জানতো না। কাগজের নামও ছিল তাদের অপরিচিত।

মুসলমানরাই ইউরোপকে কাগজ চিনিয়েছে। কাগজের ব্যবহার শিখিয়েছে। ইউরোপের লোকেরা কাগজের সাথে পরিচিত হয়েছে মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়ের পর।

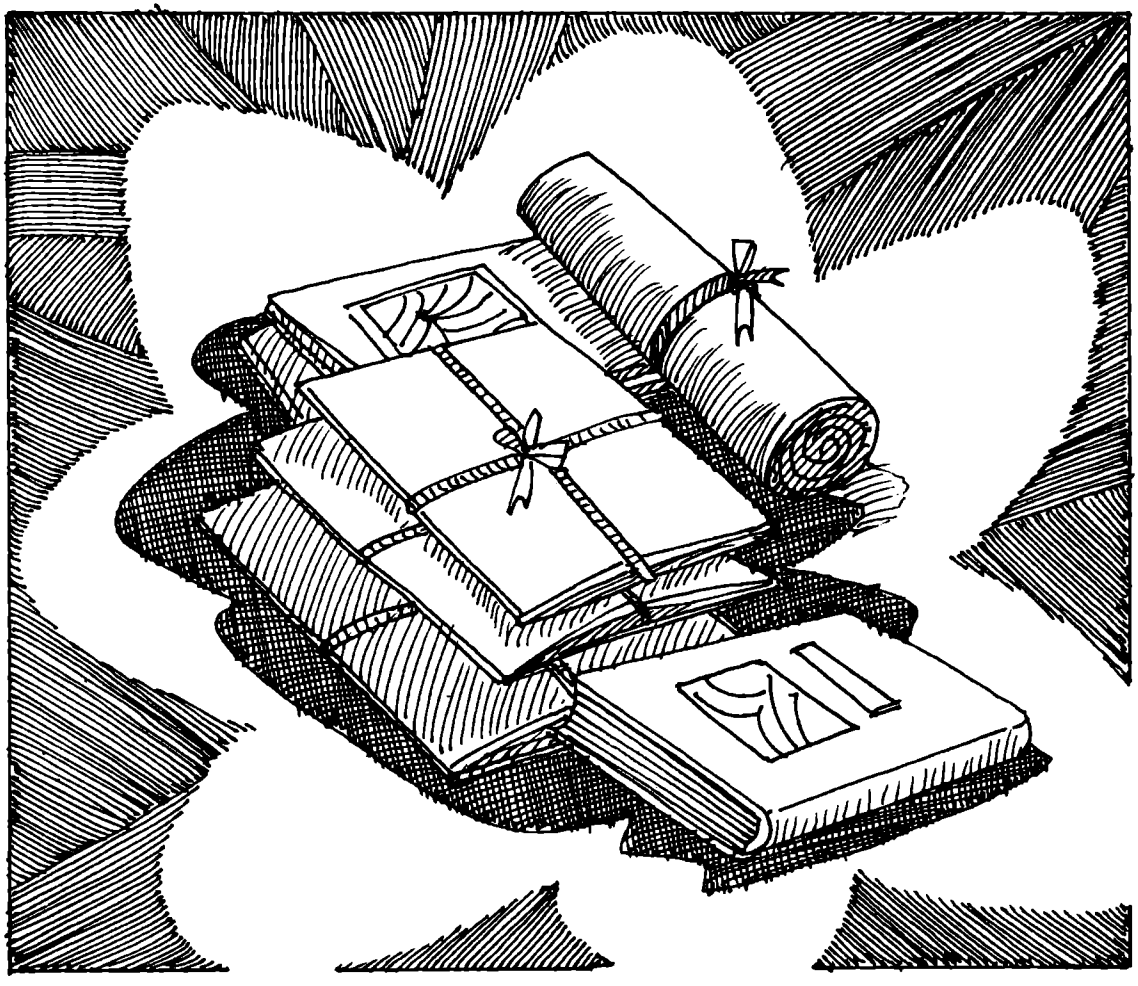

www.pathagar.com

কাগজ গেলো স্পেনে

ইউরোপের স্পেন। সেদেশে ইসলামের নিশান উড়ালেন বীর সেনাপতি মুসা। তারপর সে দেশ পরিচিত হলো সভ্যতার সাথে।

সভ্যতার বাহনরূপে মুসলমানরাই কাগজ চালু করলেন স্পেনে। মুসলমানরাই স্পেনে চালু করলেন কাগজ তৈরির প্রথম কারখানা। এর আগে স্পেনে শুধু নয়, সমগ্র ইউরোপে কোন কাগজের কারখানা ছিল না। একথা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা নামক বিখ্যাত জ্ঞানকোষ থেকেও জানা যায়।

মুসলমানরা স্পেন শাসন করেন সাতশ' বছর। এই দীর্ঘ সময়ে স্পেনের চেহারা পুরোপুরি পাল্টে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি হয়। শিক্ষায়-সভ্যতায় নামি-দামি হয়ে ওঠে স্পেন। মুসলমানদের ছিল তলোয়ারের তেজ আর বুদ্ধির জোর। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরাই ছিল সেরা জাতি। তাদের আদর্শ ইসলাম। মুসলমানরা যতদিন ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করেছে, তাদের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারেনি।

www.pathagar.com

ইতালী ও ফ্রান্সের ঋণ

স্পেনের পর মুসলমানরা জয় করেন সিসিলি। সেখানেও কাগজ তৈরির কারখানা চালু হয়। ইতালীতে সেটাই প্রথম কাগজ শিল্প। কাগজের ব্যাপারে ইতালী মুসলমানদের কাছে ঋণী। একথাও জানা যায় এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা থেকে।

স্পেন ও ইতালীর পর ফ্রান্সের কথা। ফরাসীরা কাগজ তৈরির কৌশল শিখেছে স্পেনের কাছে। ঐতিহাসিক হিট্টি একথা লিখেছেন। তখনকার স্পেন মানে মুসলিম স্পেন। মুসলমানদের স্পেন। কাগজের জন্য ফ্রান্সেরও ঋণ তাই মুসলমানদের কাছে।

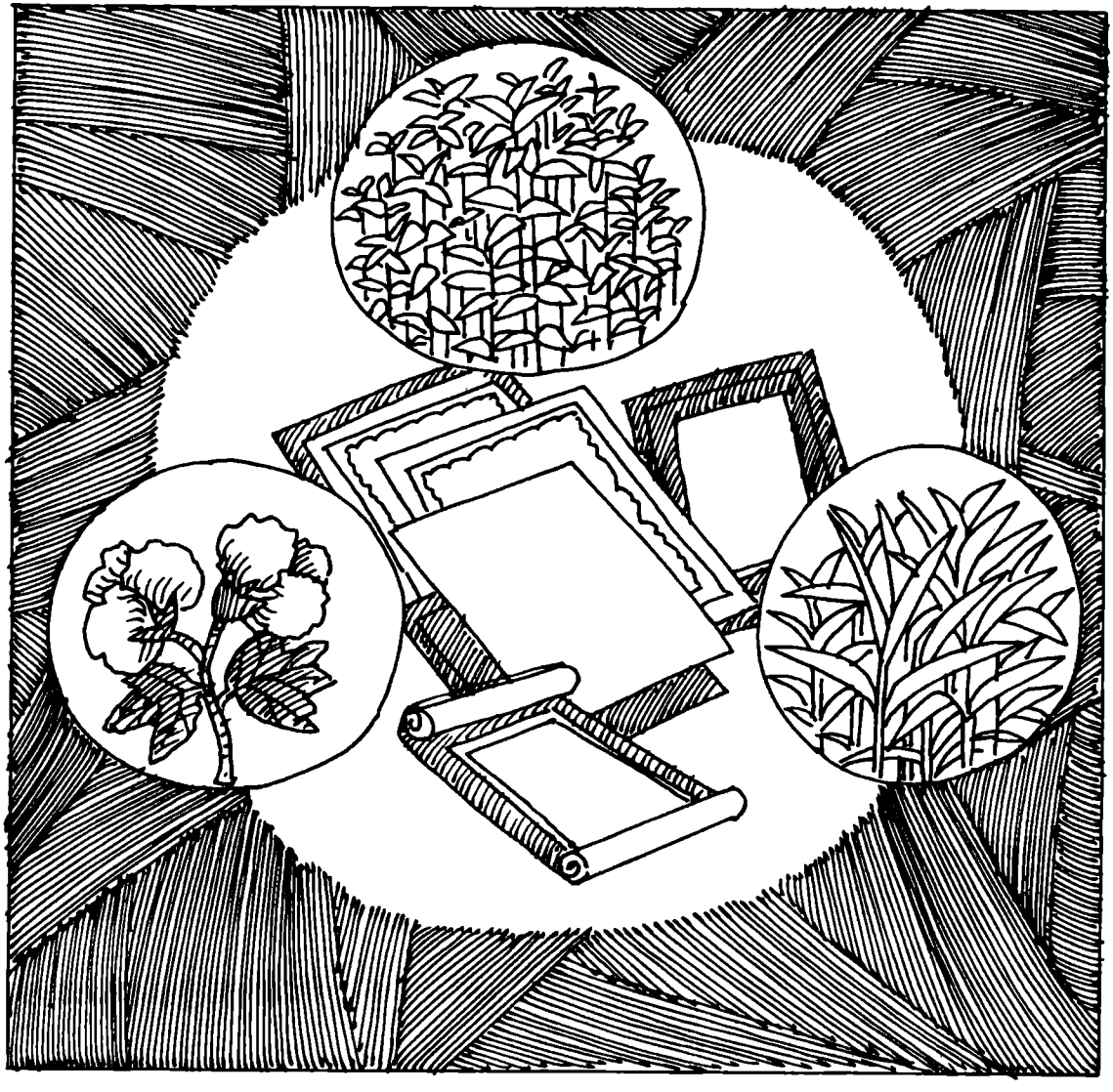

www.pathagar.com

পেপিরাস থেকে পেপার

কাগজের ইংরেজি প্রতিশব্দ পেপার। এই 'পেপার' শব্দটি এসেছে মিসরের 'পেপিরাস' থেকে। অতীতে নীল নদের তীরে 'পেপিরাস' নামক উদ্ভিদ থেকে লেখার কাগজ তৈরি হতো। সেই পেপিরাস থেকেই নাম হয়েছে পেপার। পেপিরাসের সৌখিন ব্যবহার এখনো চালু আছে।

মুসলমানরা চীন থেকে কাগজ তৈরির কৌশল এনে ছড়িয়ে দিলেন দেশে দেশে। শুধু তা-ই নয়। কাগজ তৈরির আরো অনেক নতুন কৌশল তারা আবিষ্কার করেন। শন, পাট, তূলা, কাপড়ের নেকড়া—এসব থেকে কাগজ তৈরিও মুসলমানদের আবিষ্কার।

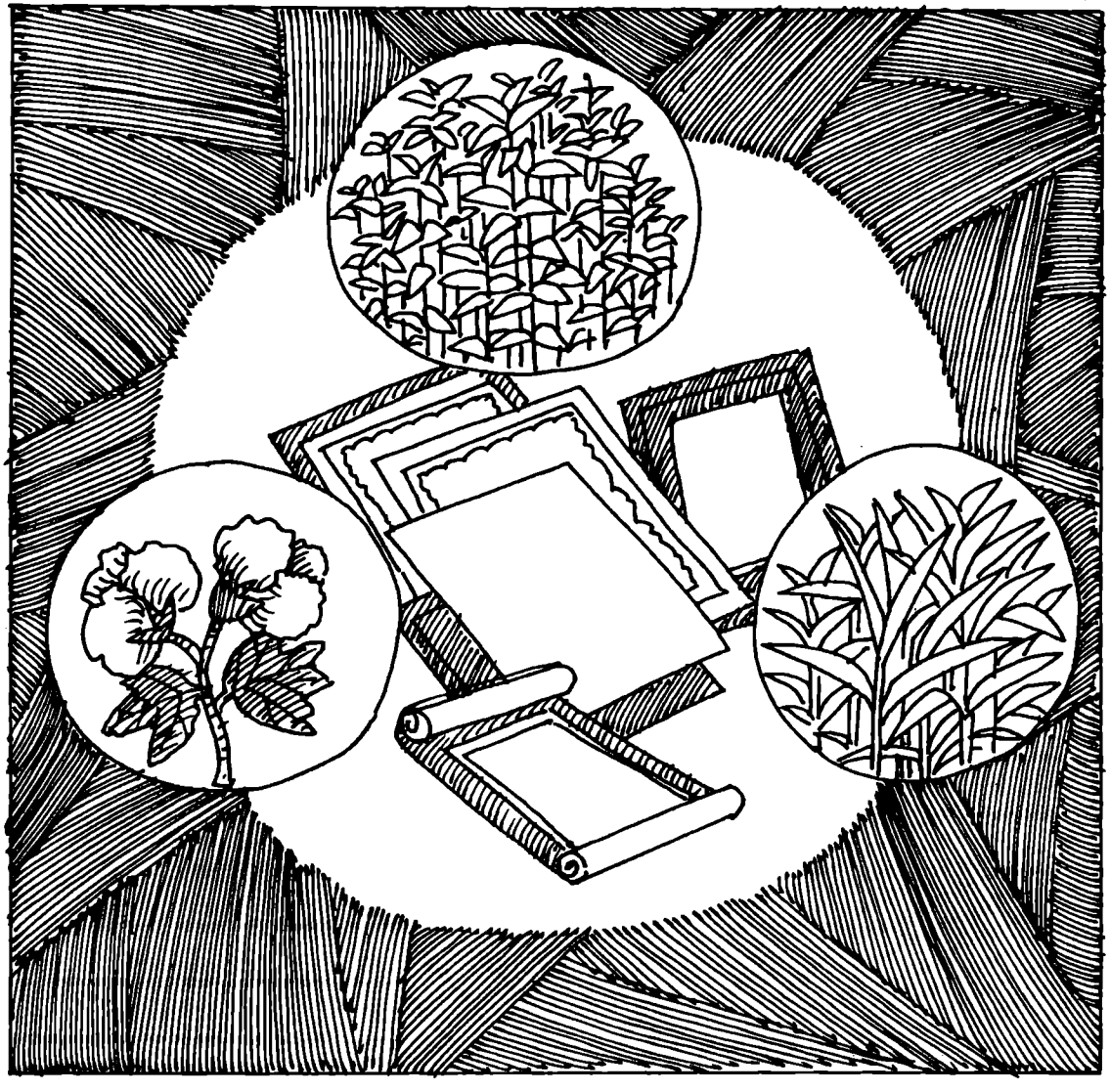

www.pathagar.com

সুলতান মাহমুদ ও কাগজ শিল্প

এই উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের সূচনা করেন সুলতান মাহমুদ। তিনি ছিলেন গযনীর শাসনকর্তা। এ জন্য তাঁর পরিচয় সুলতান মাহমুদ গযনভী। এ উপমহাদেশে তিনিই স্থাপন করেন কাগজ তৈরির প্রথম কারখানা। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে।

সুলতান মাহমুদ গযনভীর উদ্যোগে প্রথম কাগজ শিল্প চালু হয় কাশ্মীর ও পাঞ্জাব এলাকায়। মুসলিম শাসকদের সাহায্য আর সহযোগিতায় এখানে বেড়ে ওঠে কাগজ শিল্প। এ শিল্পের উন্নতি হয় ধাপে ধাপে।

www.pathagar.com

বখতিয়ার খিলজীর সতেরো ঘোড়া

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার হয় অনেক অনেক দিন আগে। মুসলিম শাসন চালুর অনেক আগে আসেন ইসলাম প্রচারকরা। আলিম, সুফী-দরবেশ ও মুজাহিদ-গাযীরা এখানে ইসলামের আবাদ করেন। তারও অনেক দিন পরে কায়েম হয় মুসলিম শাসন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নাম কে না জানে ! বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসন কায়েম করেন এই তুর্কী বীর। সে ছিল এক অবাক করা ঘটনা। ১২০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সে ঘটনা ঘটে। সতেরোজন মুসলিম বীর ঘোড়সওয়ার সাথে নিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে এলেন তিনি।

তখন আমাদের দেশ সেন বংশের রাজাদের দখলে ছিল। কর্নাটক দেশের সেনরা জোর করে এদেশ দখলে রেখেছিল। তাদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ ছিল। বখতিয়ার খিলজীর আগমনে এদেশের মানুষ জুলুম থেকে মুক্তি পেল। তারা উৎসব পালন করে বখতিয়ারকে স্বাগত জানালো।

www.pathagar.com

ছড়িয়ে গেলো জ্ঞানের আলো

মুসলিম শাসন চালুর ফলে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। আলোকিত হলো বাংলাদেশ। এখানেও চালু হলো কাগজ তৈরির কারখানা। আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর আগে। মুসলিমদের হাতে কাগজ শিল্প চালু হলো। এ শিল্পের উন্নতিও হলো দ্রুতগতিতে।

ফারসি ভাষার 'কাগজ' শব্দটিও ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। কাগজের সাথে সাথে পরিচিত হলো আরবি ভাষার 'দোয়াত' 'কলম' ইত্যাদি আরো কত শব্দ। কাগজ তৈরীর নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলো এদেশের মানুষ।

পাট, শন, মেস্তা। তুঁত গাছের ছাল। নেকড়া, পুরানো কাগজ। পিসবোর্ডের টুকরা। এসব দিয়ে লোকেরা কাগজ তৈরি করলো। কাগজের কারখানা ছড়িয়ে পড়লো দেশের নানান জায়গায়।

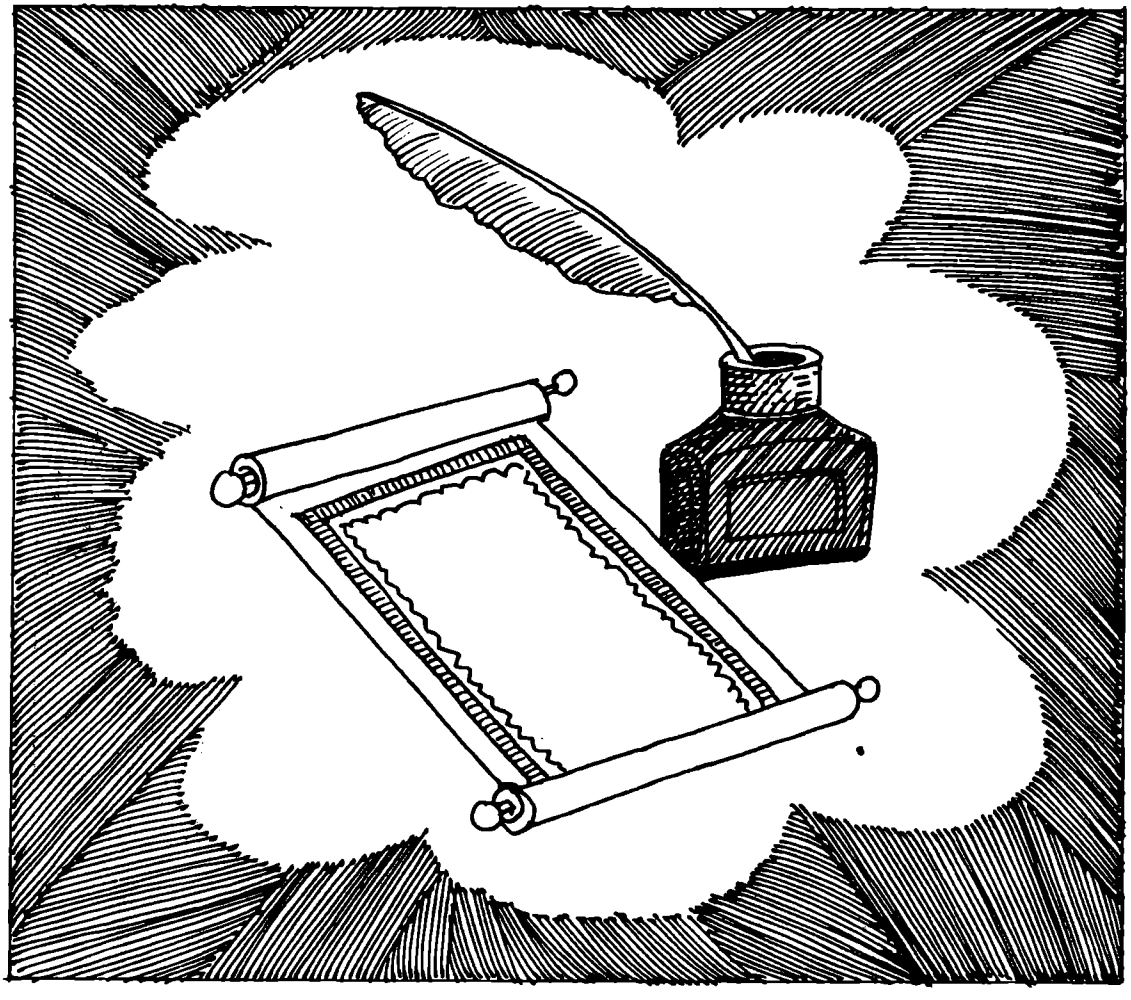

www.pathagar.com

রাজশাহীর কাগজ দিল্লীতে

এখন থেকে পাঁচশ' বছর আগে রাজশাহী এলাকায় প্রচুর কাগজ তৈরি হতো। তখন ছিল মুসলিম সুলতানদের শাসন। সে যুগে বাংলাদেশে তৈরি হতো উন্নতমানের কাগজ। মিহি সাটিনের মতো ছিল সে কাগজ।

এই কাগজ দিল্লীর সম্রাটদের দরবারে সমাদর লাভ করেছিল। দিল্লীর সম্রাটদের দফতরের লেখালেখির কাজেও ব্যবহার হতো আমাদের রাজশাহীর কাগজ।

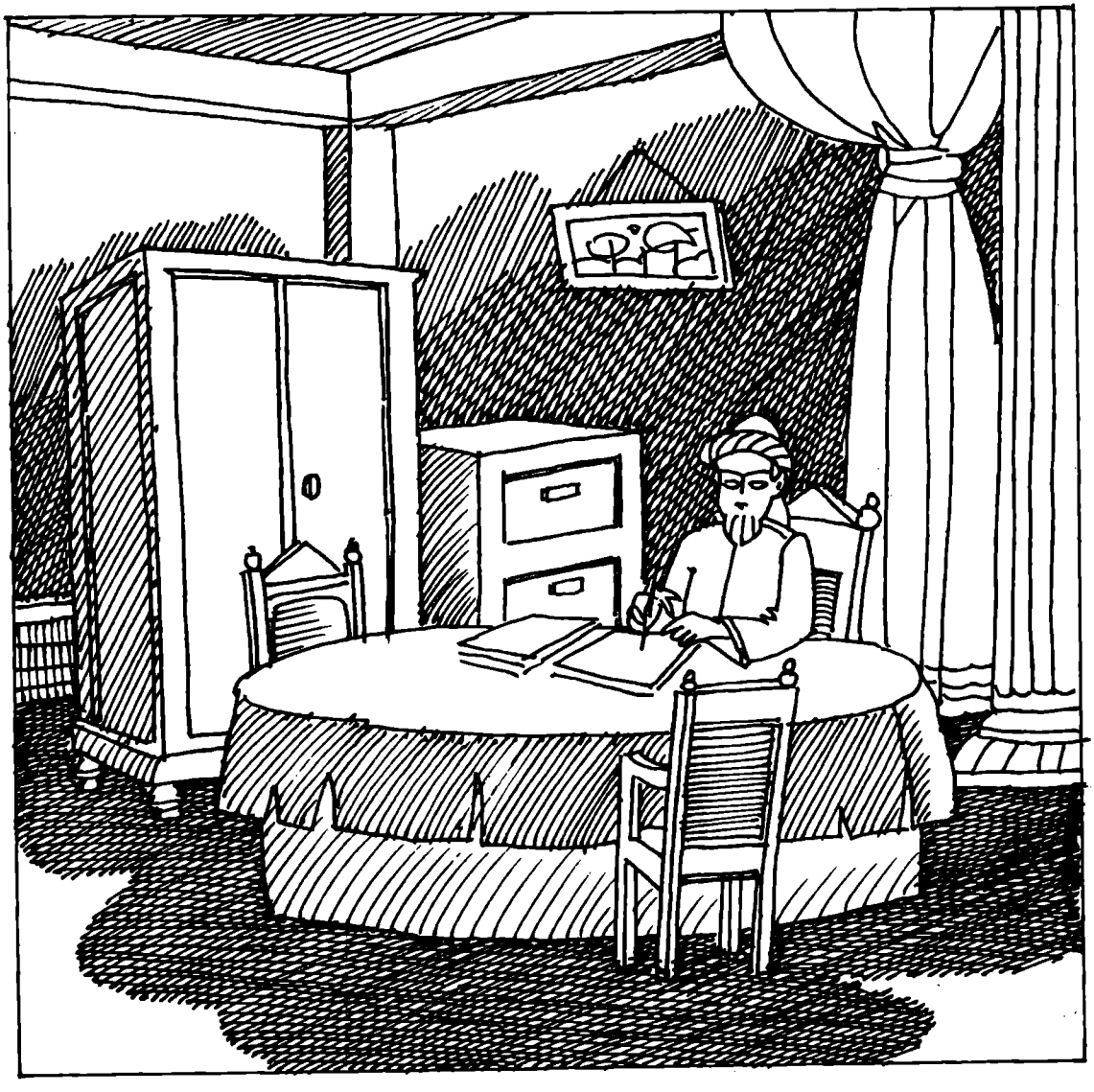

www.pathagar.com

চীনা দলিলে বাংলাদেশের কাগজ

চীনা ভাষার একটি প্রাচীন দলিল। সে দলিল থেকে জানা যায় পাঠান আমলে বাংলাদেশে কাগজ তৈরির বিবরণ। জানা যায়, তুঁত গাছের ছাল থেকে এদেশে কাগজ তৈরির কথা।

বাংলাদেশে পাঠান শাসন চালু করেন শেরশাহ। এই বংশের সুলায়মান কররানী ছিলেন আরেকজন বিখ্যাত শাসক। সুলায়মানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের বীরত্বের কাহিনী ছড়িয়ে আছে অনেক জায়গায়।

পাঠান আমল আমাদের দেশের সমৃদ্ধির যুগ। আমাদের কাগজ শিল্পেরও উন্নতির যুগ।

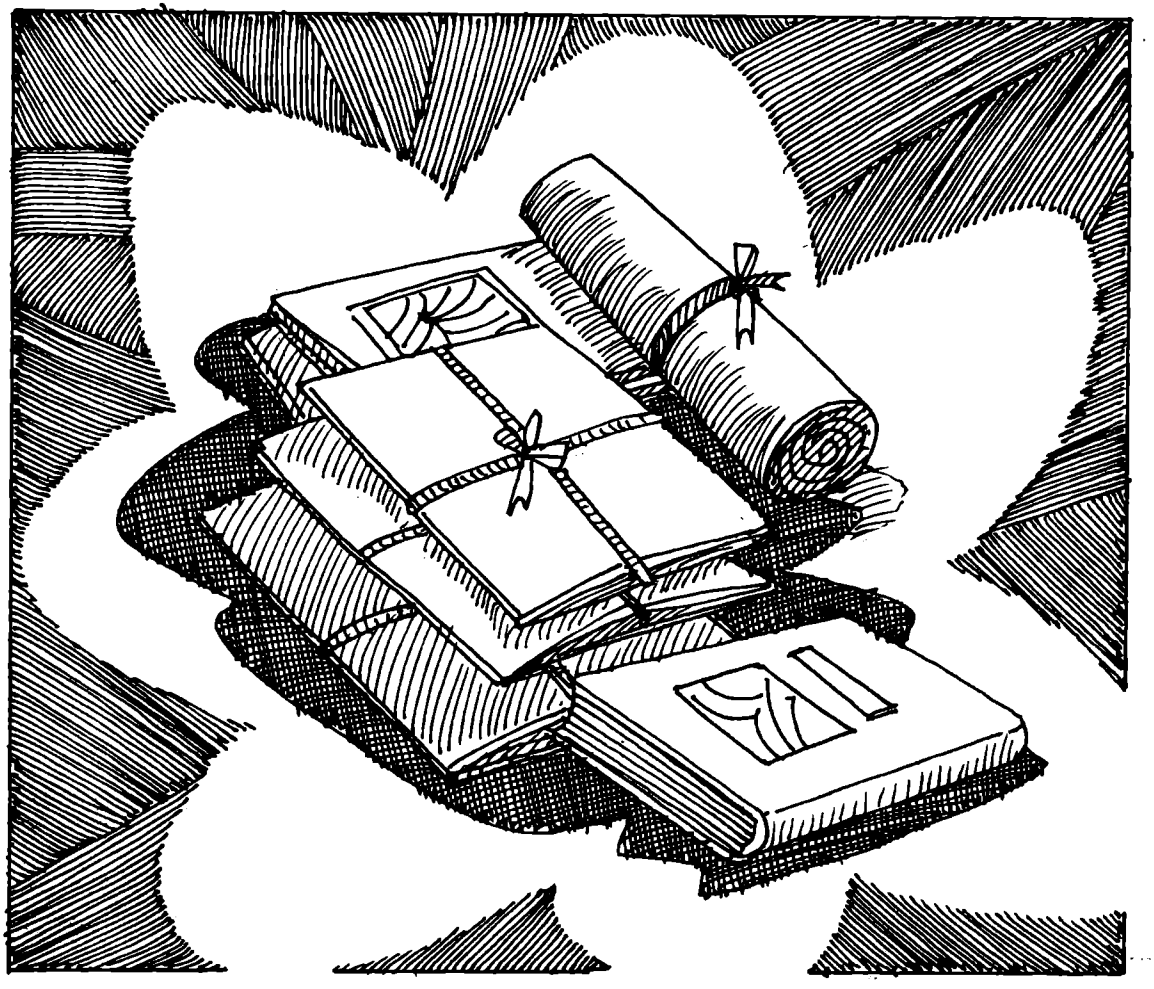

www.pathagar.com

আটিয়ার কাগজীদের কথা

মুসলিম শাসন আমল বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের সূচনার যুগ। কাগজ শিল্পের স্বর্ণ যুগ। দেশের বিভিন্ন এলাকায় হাতে তৈরি কাগজ শিল্পের অনেক উন্নতি হয়। বৃহত্তর মোমেনশাহীর আটিয়া ছিল সে যুগের উল্লেখযোগ্য জনপদ। আটিয়া ছিল তখনকার একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। আটিয়া কাগজ শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্রও ছিল।

ইংরেজ আমলেও টাঙ্গাইলের পরিবর্তে আটিয়া ছিল মহকুমা সদর। একটি ঐতিহাসিক মসজিদ আজও আটিয়াকে বিখ্যাত করে রেখেছে। এই ঐতিহাসিক মসজিদের ছবি আমাদের টাকায় অনেক দিন ছাপা হয়েছে।

কিছুদিন আগেও আটিয়ায় কয়েকঘর 'কাগজী' মুসলমান বাস করতেন বলে জানা যায়। ১৮৭২ সালে বৃহত্তর মোমেনশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় অন্তত ৭২টি কাগজের কারখানা ছিল।

www.pathagar.com

ঢাকার কাগজীটোলা

নবাব শায়েস্তা খাঁ ছিলেন বিখ্যাত মোগল সুবাহদার। তার আমলে আমাদের দেশের কাগজ শিল্প বিশেষ সহযোগিতা লাভ করে। সরকারী দলিল-দস্তাবেজ লেখার জন্য কাগজ দরকার। শায়েস্তা খাঁ কাগজের বহু কারিগরকে ঢাকার শহরতলীতে জড়ো করেন। তাদেরকে তিনি বসবাসের জন্য জমি দান করেন।

ঢাকার একটি মহল্লার নাম কাগজীটোলা। এই নাম ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কাগজশিল্পীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কাগজ শিল্পের সাথে জড়িত এমনি অনেক নাম ঢাকায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে।

মুন্সিগঞ্জ, কাগজীপাড়া, আড়িয়ল, দুলিহাটা, নগরপাড়, দীঘির পাড়, ধৈর পাড়া। এসব এলাকা ছিল কাগজ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। প্রায় এক লাখ লোক এসব এলাকায় এক সময় কাগজ তৈরির কাজ করতেন।

www.pathagar.com

কাগজের নাম জরফসান

মুসলিম শাসন আমলে বাংলাদেশে তৈরি হতো তিন ধরনের কাগজ। এক ধরনের কাগজ সবাই ব্যবহার করতেন। আরেক প্রকার কাগজ ছিল উন্নত মানের। দামী এই কাগজ ব্যবহার করতেন আমীর-ওমরাহ বা উচ্চপদস্থ লোকেরা। আরেকটি বিশেষ ধরনের কাগজ এদেশে তৈরি হতো। তা ঘোঁটা কাগজ নামে পরিচিত।

এই ঘোঁটা কাগজ ছিল তিন প্রকার। সাধারণ সাদা কাগজ কড়ি বা নুড়ির সাহায্যে পালিশ করে মসৃণ করা হতো। দ্বিতীয় প্রকার কাগজ 'জরফসান' নামে পরিচিত ছিল। জরফসান কাগজে রূপালী ও সোনালী ছিটা দেয়া থাকতো। তৃতীয় প্রকার ঘোঁটা কাগজে ছোট ছোট পাটালী আকারের রূপালী ও সোনালী পাত বসানো থাকতো। ঘোঁটা কাগজ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার করা হতো। এই কাগজের আকার ছিল লম্বাটে।

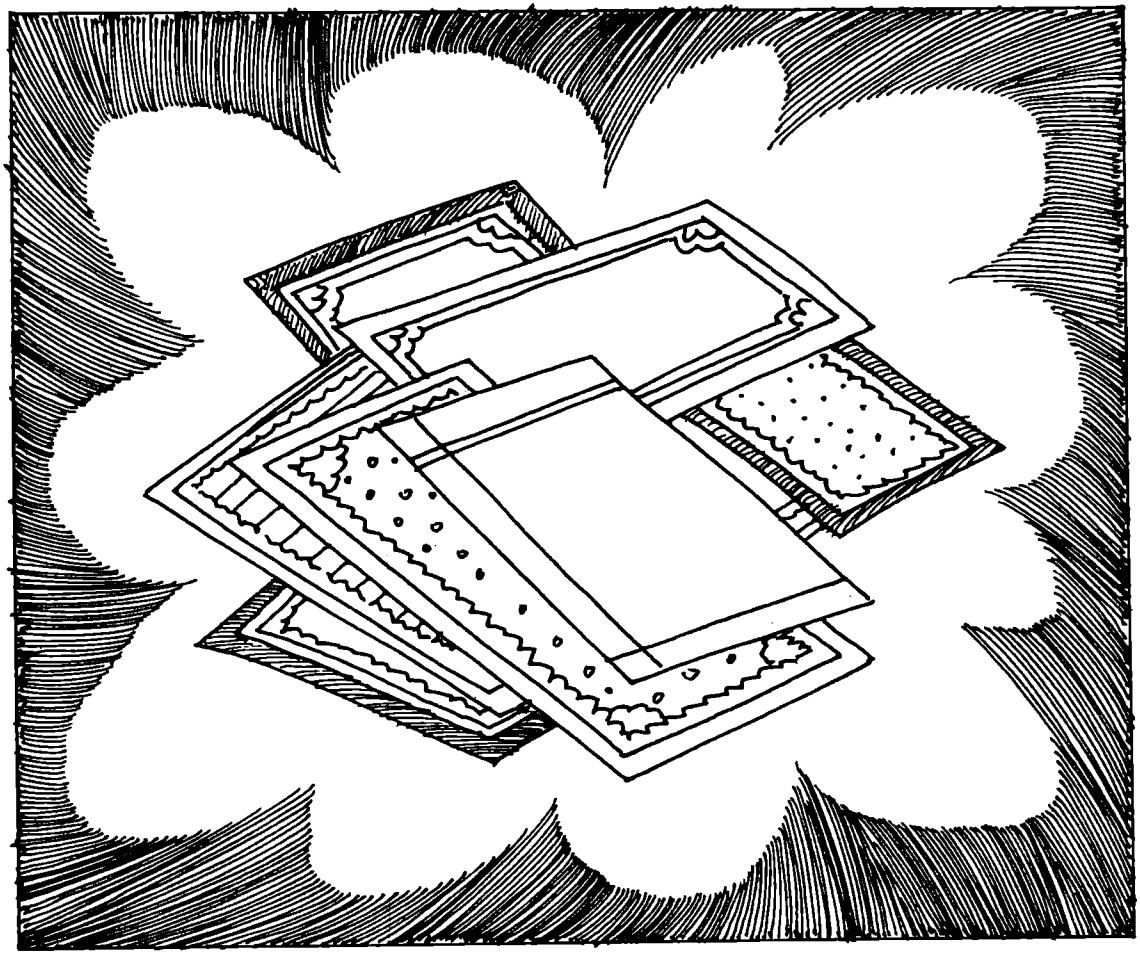

www.pathagar.com

কোমরবন্দ ও মখমলের বগলি

তখনকার দিনে কাগজ ছিল দামি পণ্য। দুর্লভ এই কাগজ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হতো। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত কাগজ আরেক প্রস্থ কাগজ দিয়ে জড়িয়ে রাখা হতো। জড়িয়ে রাখার এই কাগজ খণ্ডটিকে বলা হতো 'কোমরবন্দ'। লেখা কাগজটি কোমরবন্দের মধ্যে রাখার পর সেটিকে একটি মখমলের বগলি'র ভিতর পুরে রাখা হতো। বগলি'র মুখ বন্ধ করা হতো জরির দড়ি দিয়ে।

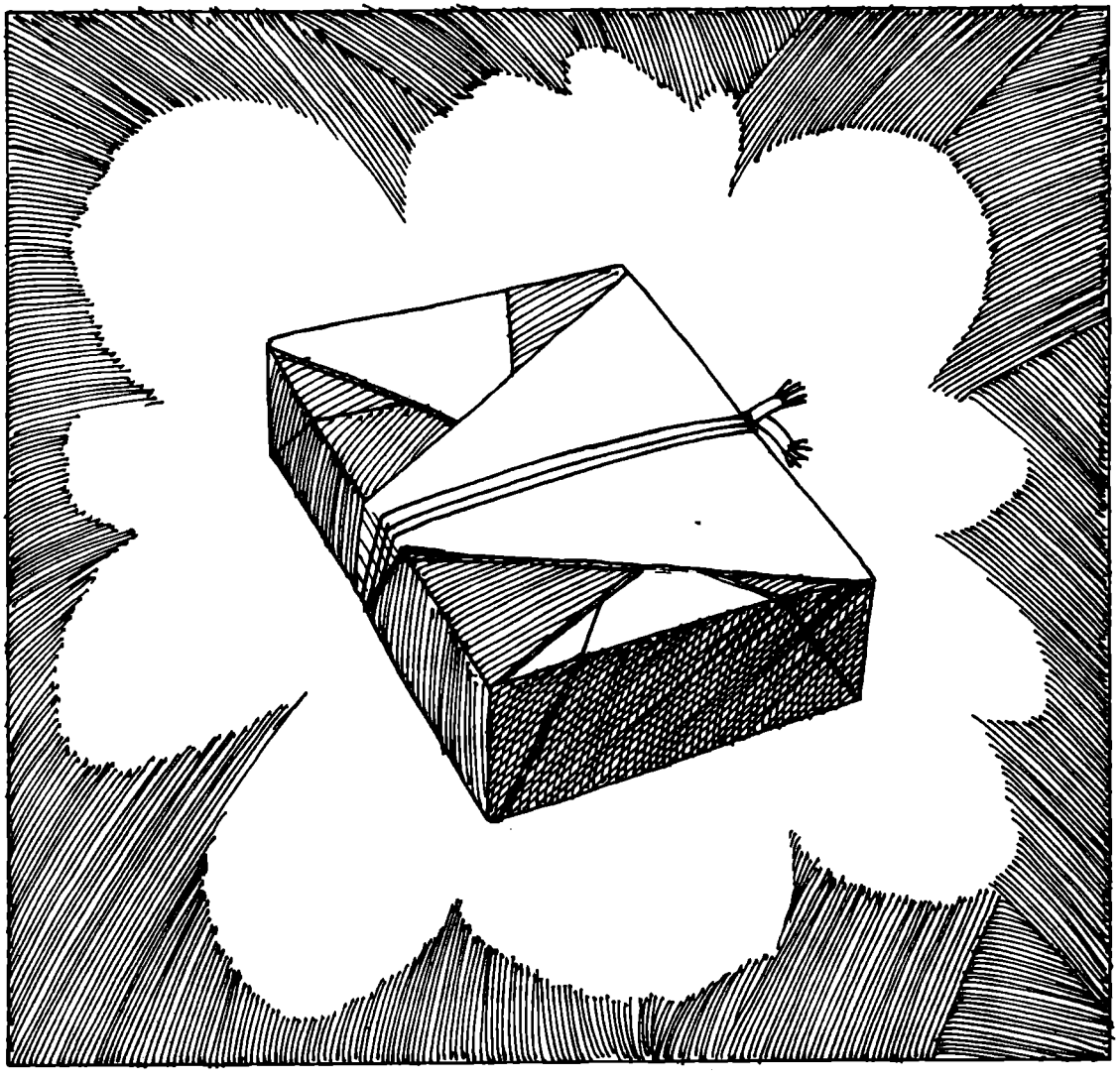

www.pathagar.com

রংপুরের কাগজ সম্পর্কে হান্টার

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রথম চালু হয় রংপুর এলাকায়। ফলে রংপুর প্রাচীনকাল থেকেই কাগজ তৈরির কেন্দ্র ছিল। এক সময় কাগজ উৎপাদনই ছিল রংপুরের সেরা শিল্প। তখনকার কাগজ শিল্প মানে কুটির শিল্প। ১৮৩২ সালেও শুধু রংপুরেই ১৩০টি কাগজ তৈরির কারখানা চালু ছিল। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টার এ কথা উল্লেখ করেছেন।

রংপুরের এসব কারখানা ছিল ভাগনি, পানিলাঘাট, দরগাহপুর, বল্লাকান্দী ও কসুরায়। এখানকার এক-একটি বড় কারখানায় প্রতিদিন এক রীমেরও বেশী কাগজ তৈরি হতো। প্রতি রীম কাগজের ওজন ছিল প্রায় পাঁচ সের। এক মণ পাট দিয়ে তৈরি হতো আট রীম কাগজ। প্রতি রীম কাগজ তৈরির খরচ পড়তো সাত টাকা এক আনা।

তখন কাগজের ব্যবহার ছিল কম। রংপুরে যত কাগজ তৈরি হতো তা এই জেলার চাহিদা মিটিয়ে বাইরে রফতানী করা হতো।

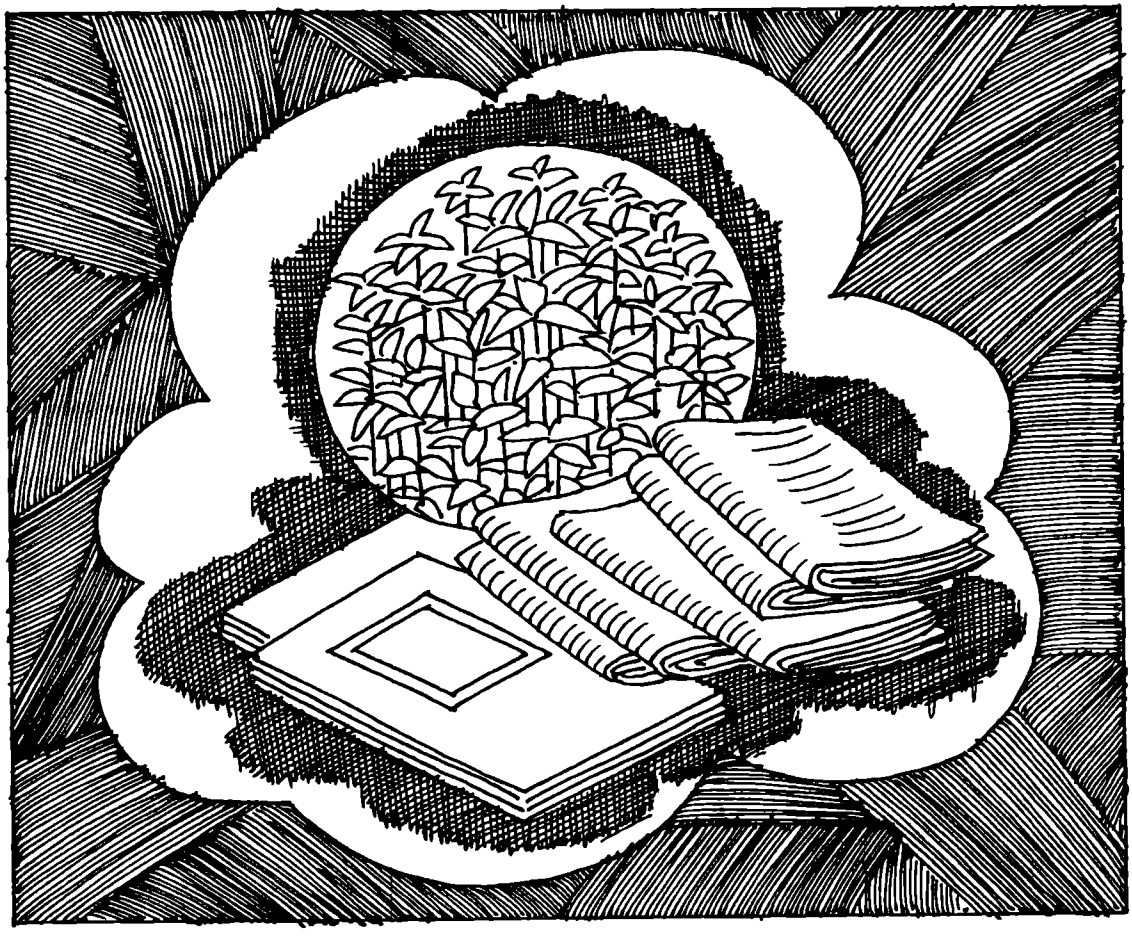

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জের কাগজ

কাগজ তৈরিতে পাবনার সিরাজগঞ্জ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কাগজ তৈরি হতো মেস্তা। তাতে পাটের তুলনায় খরচ পড়তো কম। উইলিয়াম হান্টার পাবনায় কাগজ তৈরির পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে কাগজ তৈরির জন্য মেস্তার সাথে শামুক বা ঝিনুকের চুন, আতপ চাল এবং তেল ব্যবহার করা হতো। এক মণ মেস্তার সাথে প্রয়োজন হতো বিশ সের শামুক বা ঝিনুকের গুঁড়া, দশ সের আতপ চাল এবং দু'ছটাক তেল।

www.pathagar.com

পুরনো দিনের বাজার দর

হান্টারের বিবরণ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাজার দর সম্পর্কেও আমরা ধারণা পেতে পারি। সে সময় একমণ মেস্তার দাম ছিল সাড়ে চার টাকা। বিশ সের চুন আট আনা। দশ সের আতপ চাল দশ আনা। এখনকার হিসাবে বাষট্টি পয়সা। আর দু'ছটাক সরিষার তেল মাত্র ছয় পাই অর্থাৎ এখনকার মাত্র তিন পয়সা।

বিশ থেকে পঁচিশ দিস্তা কাগজ তৈরিতে ব্যয় হতো পাঁচ টাকা সাড়ে দশ আনা। বাজারে সে কাগজ বিক্রি হতো সাড়ে দশ টাকা। লাভ থাকতো প্রায় পাঁচ টাকা।

চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলও কাগজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া কাগজ তৈরির কাজে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল।

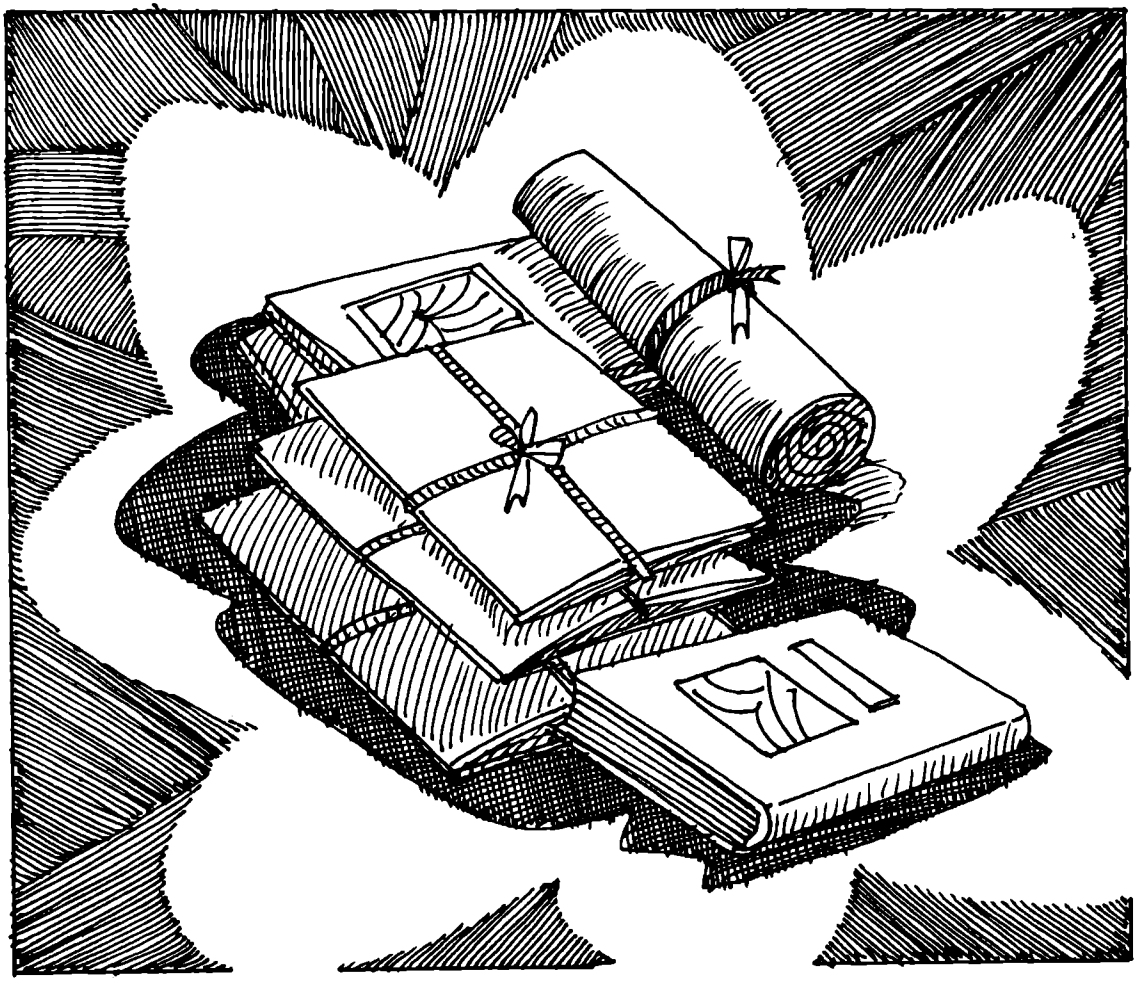

www.pathagar.com

কাগজ বানানোর নানা কৌশল

বাংলাদেশের সব জায়গায় কাগজ তৈরির পদ্ধতি এক রকম ছিল না। একেক জায়গায় একেক রকম উপাদান ব্যবহার করা হতো। কাগজ তৈরির পদ্ধতিও কিছুটা ভিন্ন ছিল।

উইলিয়াম হান্টারের লেখা বিখ্যাত বই 'স্ট্যাটিস্টিকেল একাউন্টস অব বেঙ্গল' থেকে আমরা বগুড়ায় কাগজ তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। বগুড়ায় কাগজ তৈরির জন্য পাট, শামুক বা ঝিনুকের চুন ও আতপ চালের সাথে ব্যবহার করা হতো কদু, তেঁতুলের বিচি এবং হরিতকি।

এসব কাঁচামাল ছাড়াও কাগজ তৈরির জন্য পানির বড় পাত্র, ঢেঁকি, বাঁশের খাঁচা, বাঁশ বা কাঠের দণ্ড, পাথরের নুড়ি ইত্যাদি লাগতো।

www.pathagar.com

মন্ড তৈরি

পাটের সাথে ভালোভাবে মিশানো হতো অর্ধেক পরিমাণ শামুক বা ঝিনুকের চুন। চুন মিশানো পাট পানির বড় পাত্রে আট-দশ দিন ভিজানো হতো। তারপর সেগুলো পানি থেকে তুলে এনে ঢেঁকিতে ভালোভাবে কুটা হতো। চুন বের করে নিয়ে পাটের থেতলানো তাল রাখা হতো পরিষ্কার পানির বড় বড় পাত্রে।

তিন ফুট লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া কাঠি দিয়ে সে তাল পানিতে খুব দ্রুত নাড়া হতো। এভাবেই তৈরি হতো কাগজের মণ্ড।

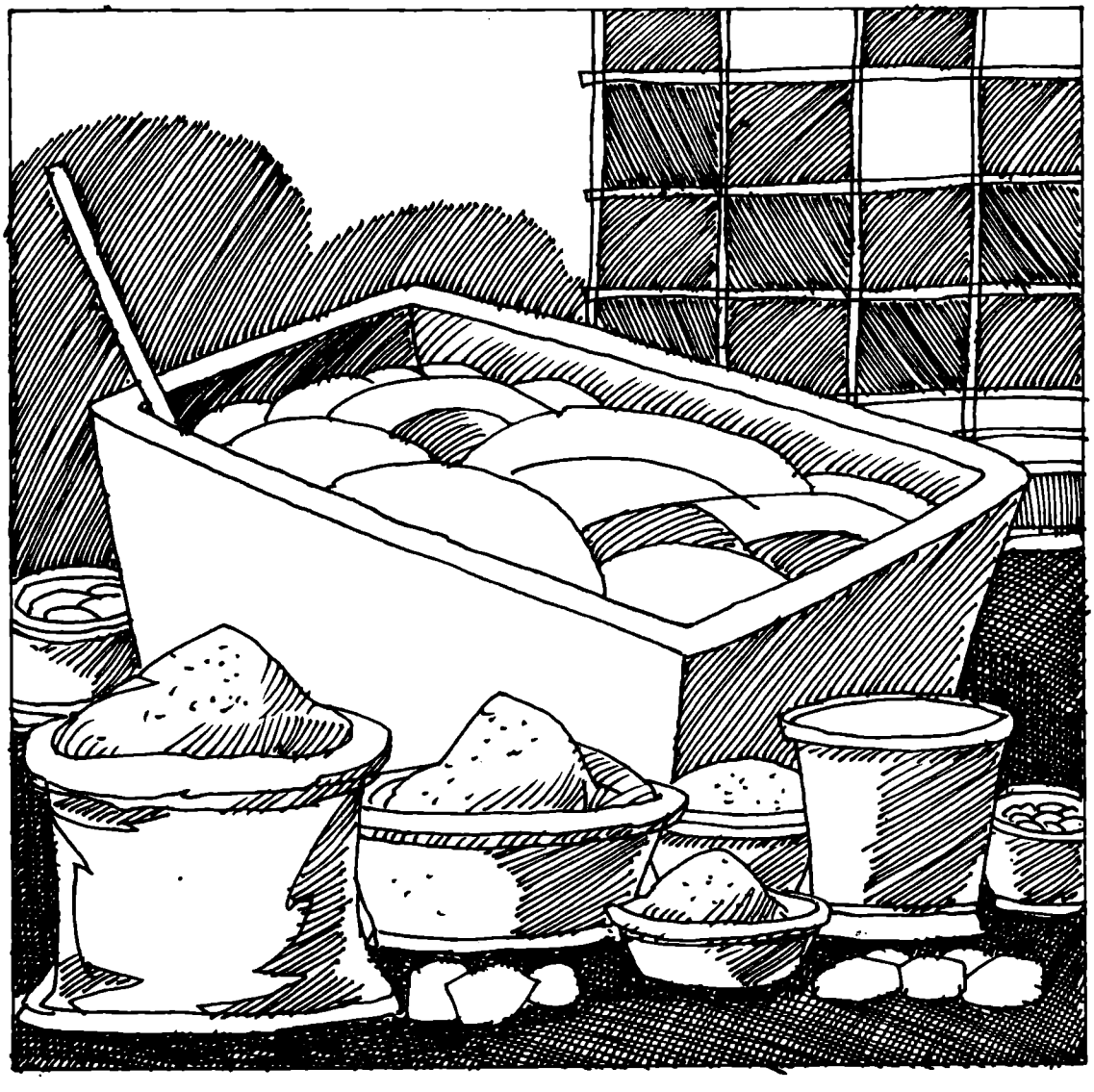

www.pathagar.com

কাগজ তৈরির বাঁশের খাঁচা

মণ্ড থেকে কাগজ তৈরির জন্য বাঁশের খাঁচা ব্যবহার করা হতো। এই খাঁচাটির তলা ছিল সমতল। যে মাপের কাগজ হবে সে মাপে তৈরী হতো খাঁচার তলা। এই খাঁচাটি মণ্ডের মধ্যে ডুবানো হতো। তার ফলে খাঁচার তলায় কিছু মণ্ড উঠে আসতো। এরপর খাঁচাটি যত্নের সাথে এদিক-ওদিক হেলানো-দুলানো হতো। ফলে খাঁচার তলা মণ্ডের পাতলা আবরণে ছেয়ে যেতো। মণ্ডের সেই পাতলা পর্দাটি খাঁচা থেকে একটা তক্তার ওপর রাখা হতো।

তক্তার ওপর কয়েক মিনিট থাকার ফলে উপরের পানি ঝরে যেতো। তারপর সে পাতলা পর্দা শুকনা মাটির দেয়ালে সেঁটে দেয়া হতো। দেয়াল শুকনা হলেও সেখানে কোন রোদ থাকতো না।

এ সময় রোদ লাগলে কাগজ নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকতো। মাটির দেয়ালে রেখে কয়েক মিনিট শুকানোর পরই এই কাগজ খণ্ড রোদে দেবার উপযুক্ত হতো।

কাগজ খণ্ডটি রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর তাতে আতপ চালের মণ্ড তুলির সাহায্যে আলতোভাবে বুলিয়ে দেয়া হতো। তারপর আবার রোদে শুকানোর পালা।

সবশেষে চাল মিশানো এই শুকনা কাগজটিকে মসৃণ পাথরের টুকরা বা নুড়ি দিয়ে পালিশ করা হতো। পালিশের কাজে অনেক সময় শামুকও ব্যবহার করা হতো।

www.pathagar.com

কাগজ তৈরিতে কদু ও তেঁতুল

আরেকটি মজার কৌশল ছিল। কাগজকে পোকার হামলা ও কুচকানো থেকে বাঁচানোর জন্য কদু ও তেঁতুলের বিচি এবং হরিতকি এক সাথে বেটে নিয়ে তা কাগজে মাখা হতো। এতে পোকার হামলা ও কুচকানো বন্ধ হতো। সেই সাথে কাগজের রং হতো চমৎকার হলুদ।

বাংলাদেশে কাগজ তৈরির এই ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প শত শত বছর টিকে ছিল। দেশের লাখ লাখ মানুষ এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল। দেশের বাইরেও ছিল হাতে তৈরি কাগজের প্রচুর সুখ্যাতি।

www.pathagar.com

যখন এলো কলের যুগ

তারপর এলো কলের যুগ। হাতের বদলে কলের সাহায্যে কাগজ তৈরি শুরু হলো। ১৮১১ সালে কলকাতার শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারীরা চালু করে প্রথম কাগজ কল। এটি ছিল একটি ছোট্ট কারখানা। এতে আমাদের দেশের কাগজ তৈরির কুটির শিল্পের তেমন ক্ষতি হয়নি।

এরপর ১৮৭০ সালে কলকাতার কাছে বালিতে একটি বড় কাগজ কল চালু হয়। এর ফলে বড় ধাক্কা লাগে আমাদের কুটির শিল্পে। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় আমাদের কাগজ শিল্পের গৌরবময় অধ্যায়।

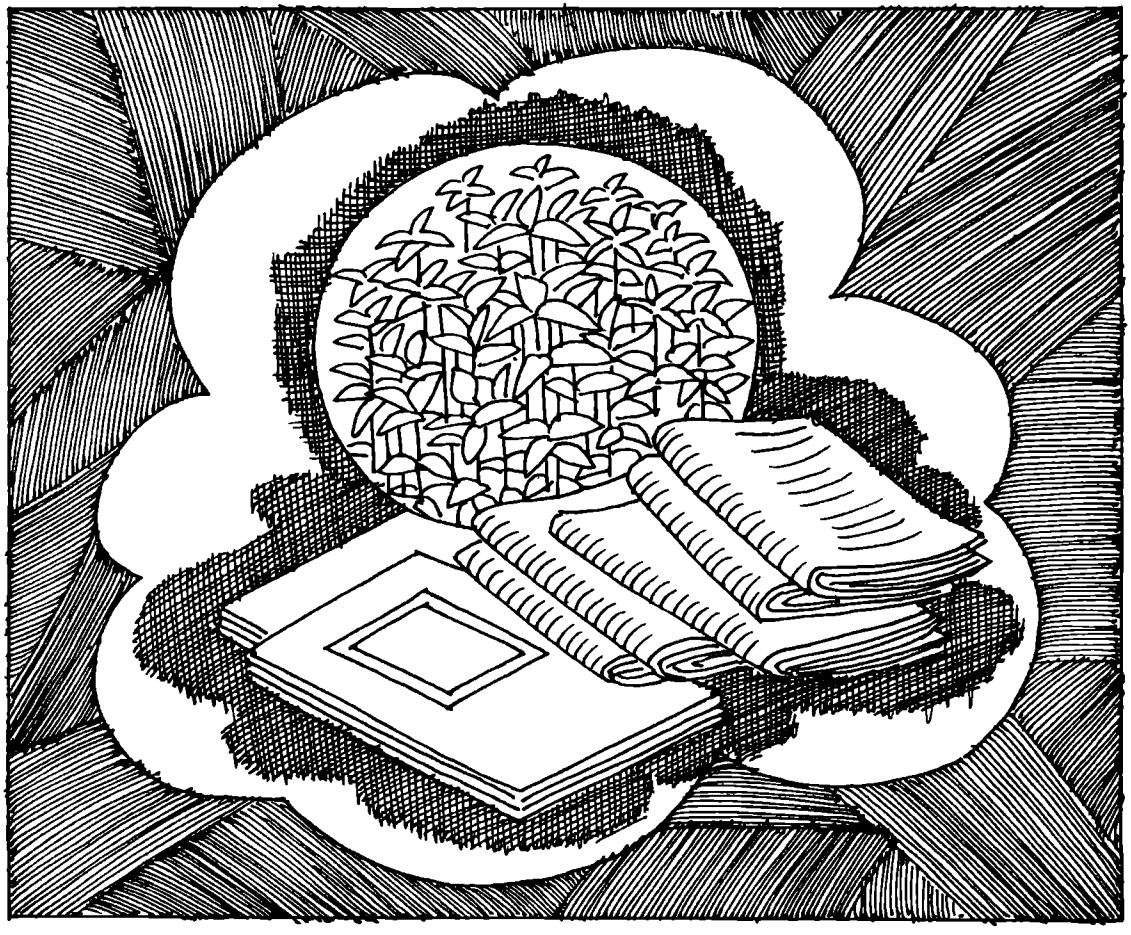

www.pathagar.com

রক্তে রাঙা নীল

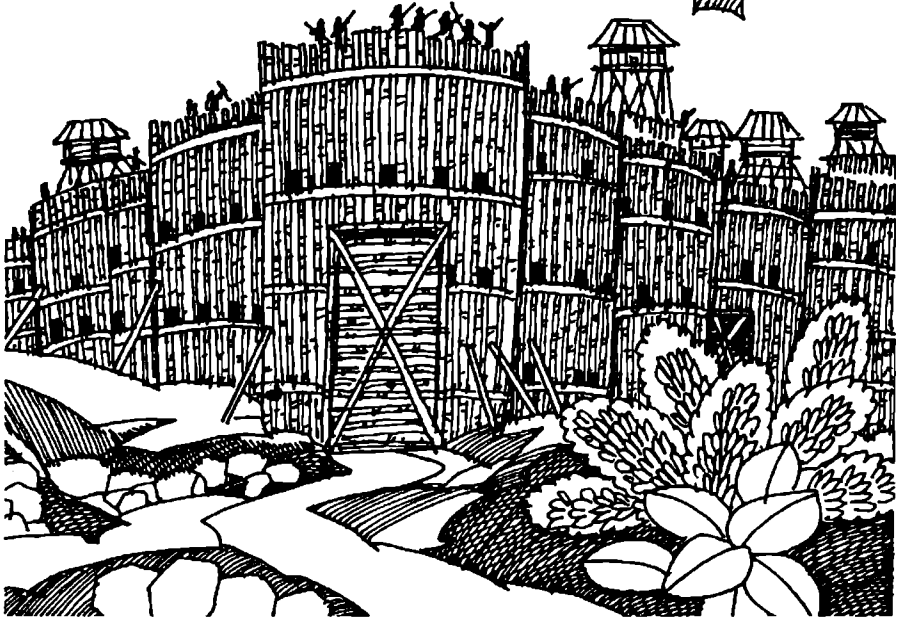

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নীলচাষী সাদেক মোল্লা ও ক্যানি-রেনীদের কেচ্ছা

নীল বানরে সোনার বাংলা
কল্লে এবার ছারখার...
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

কোন এক পল্লী কবি এভাবেই শুরু করেছেন আমাদের নীল শিল্পের কথা। নীল বানর ইংরেজ। তারা কুঠি গড়ে নানা জায়গায়। জোর করে নীল চাষ করায় চাষীদের। চাষীরা বাধ্য হয়ে ধানের জমিতে নীল ফলায়। ভাতের অভাবে না খেয়ে মরে। সোনার বাংলা ছারখার হয় ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারে।

ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে ১৭৫৭ সালে। তারপর তারা শত শত নীল কুঠি গড়ে তোলে এ দেশে। প্রতিটি কুঠির সাথে জড়িয়ে ছিল মানুষের দুঃখ আর কান্নার অসংখ্য কাহিনী। বড় করুণ সে কাহিনী। এমনি এক নীলকুঠি ছিল কুষ্টিয়া জেলার কালিদহে।

সে কুঠি সম্পর্কে বলে গেছেন আরেকজন পল্লী কবি ঃ

শুন কুঠিয়ালের সমাচার
কালিদয়ে কুঠি যার
ক্যানি সাহেব কাইজ্যার করলে শুরু ॥
সে আউশের ক্ষেতে বোনে নীল
সব রায়তের হইল মুশকিল।

নীল চাষের দুঃখ নিয়ে এমনি কত ছড়া, কবিতা আর গান লেখা হয়েছে এদেশে। নীলের কথা মানেই চাষীদের দুঃখের কাহিনী। লোভী ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচারের বৃত্তান্ত।

একদিকে ইংরেজ কুঠিয়াল। অন্যদিকে নিরিহ গরীব চাষী। ইংরেজরা বেশী মুনাফার লোভে অধিক জমিতে নীলের দাদন করে। চাষীরা বাধ্য হয়ে তাদের ধানের ক্ষেতে নীল বোনে।

চাষীদের ঘরে চাল নেই। পকেটে পয়সা নেই। তাই তারা উপোস করে। তারা নীলের দাম পায় না। প্রতিবাদ করলে নেমে আসে জুলুম-নিপীড়ন। নীলের এ করুণ চিত্রই ভাসে আমাদের চোখে।

www.pathagar.com

নীলের অন্য রকম কাহিনী

নীলের কাহিনী সব সময় দুঃখের ছিল না। এককালে নীল ছিল আমাদের সবচে' দামি ফসল। মূল্যবান শিল্প-সম্পদ। গুরুত্বপূর্ণ রফতানী পণ্য। নীল ছিল আমাদের অহংকার। নীলের সে গৌরবের কথাই আগে বলি।

এক সময় নীল ছিল কেবলই বুনো গাছ। নীলের প্রথম আবাস ভারতীয় উপমহাদেশ, আফ্রিকা আর আরবের বন-জঙ্গল। আমাদের উপমহাদেশের সাথে এর সম্পর্ক ছিল সবচে' নিবিড়।

বুনো নীল গাছকে চাষের আওতায় আনা হয়। শুরু হয় কৃষি জমিতে নীলচাষ। চাষাবাদের মাধ্যমে নীলকে রং-এর কাজে লাগানো শুরু হয়। তাও অনেক অনেক দিন আগে।

প্রচুর নীল উৎপন্ন হতো এই উপমহাদেশে। নীলের ব্যবহারও আমাদের অঞ্চলেই সবচে' বেশী ছিল। আমাদের দেশে তৈরী হতো পৃথিবীর সেরা কাপড়। সে কাপড় রফতানী করা হতো বিদেশে। এছাড়া প্রচুর নীলও রফতানী হতো এদেশ থেকে।

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিগো

বুনো নীল গাছের জাতিগত নাম 'ইণ্ডিগো কো-ইরুলিয়া'। ইণ্ডিয়া থেকেই ইণ্ডিগো। ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্য হিসাবে নীলের জাতিগত নাম 'ইণ্ডিগো ফেরা'। বাংলাদেশ ও ভারতে উৎপাদিত সবচে' ভালো জাতের নীলকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হতো 'ইণ্ডিগো টিনটোরিয়া'। অন্যেরা যে নামেই ডাকুক, নীল আমাদের দেশে 'নীল' নামেই পরিচিত। ফারসী ভাষায় এর নাম 'তুখমে নীল'। আরবীতে বলা হতো 'আবুন নীল'।

www.pathagar.com

মিসরের পিরামিডে নীলে রাঙা মসলিন

মিসরের পিরামিডে সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো ফেরাউনের মমি। তাতে আমাদের দেশের মসলিন পাওয়া গেছে। সে মসলিন আমাদেরই নীল দিয়ে রং করা।

ছয় শতকের একজন পণ্ডিত ছিলেন বরাহ মিহির। তার লেখা বই 'ভারত সংহিতা'য় আছে নীল উৎপাদনের কথা। প্রাচীন যুগে আমাদের নীল রফতানী হতো গ্রীস ও রোমে। মধ্যযুগে নীলের বড় ক্রেতা ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী।

তেরো শতকের মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকেও জানা যায় আমাদের নীলের কথা। ১২২৮ সালে আমাদের এ এলাকা থেকে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে নীল যেতো বাগদাদ হয়ে। ষোল শতকে ইউরোপে নীলের চাহিদা বাড়তে থাকে। সম্রাট আকবরের সময় নীল ছিল এদেশের সবচে' দামি কৃষিপণ্য। আবুল ফযল লিখেছেন, গমের তুলনায় তখন নীলের আনুপাতিক দাম ছিল আড়াই গুণেরও বেশী।

নীল চাষে লাভ বেশী। তাই নীলের জমির খাজনাও ছিল বেশী। ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে ১৭৫৭ সালে। ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের এক বিবরণীতে বলা হয়, ইউরোপের যত নীল দরকার, বাংলাদেশ একাই তার বিরাট অংশ পূরণ করতে পারে।

ওষুধ হিসেবেও নীলের ব্যবহার ছিল। নীলের বীজ থেকে একপ্রকার তেল বা আরক তৈরী করা হতো। এই আরক মৃগীরোগ, স্নায়ুরোগ, ব্রঙ্কাইটিস, ক্ষত ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহার করা হতো।

www.pathagar.com

তিন রকম নীল গাছ

নীল চাষ ও নীল তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে অতীতের কয়েকজন লেখকের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে আছেন পনেরো শতকের উইলিয়াম কিনস ও ট্রাভারনিয়ার। তাঁদের কাছ থেকে নীলচাষ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। নীল গাছ থেকে নীল বের করার কৌশল জানা যায়।

নীল গাছ ছিল দু'হাত উঁচু। শক্ত শেকড় ও কাণ্ডের ওপর এর ছিল অনেক শাখা-প্রশাখা। নীল গাছের ছড়িগুলো আড়াই-তিন ইঞ্চি লম্বা হতো। ছড়ির ভেতর বীজ পাকতো নবেম্বর মাসে। একবার বুনলে এ গাছ বাঁচতো তিন বছর। ফসল কাটা হতো বছরে একবার, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রথম বছর কাটা কোমল নীল গাছ 'নৌতী' বা 'নন্দ' নামে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় বছরের নীল গাছের পরিচয় ছিল 'জীয়ারী' নামে। শেষ বছরের নীল গাছকে বলা হতো 'কাটেল'। সবচে' ভালো নীল পাওয়া যেতো জীয়ারী থেকে।

ইংরেজ কোম্পানীর আমলে প্রতি বছর দু'টি করে ফসল তোলা হতো। নদীর ধারের পলি পড়া জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেয়া হতো। তার ওপর দিয়ে একটা কলা গাছ টেনে নিলেই বীজ ঢাকা পড়ে যেত। চাষের কোন প্রয়োজন হতো না। তবে চাষ দেয়া জমিতে ফলন ভালো হতো।

www.pathagar.com

জোড়া জোড়া চৌবাচ্চায় নীল সাদা বুদবুদ

ফসল কাটার পর নীল গাছগুলো ধানের আঁটির মতো আগা-গোড়া করে রশিতে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো কুঠিতে। প্রত্যেক নীল কুঠিতে থাকতো পাথরে তৈরি অনেকগুলো চৌবাচ্চা।

এই চৌবাচ্চাগুলো বসানো থাকতো জোড়া জোড়া। একটি চৌবাচ্চার কিছুটা নীচে আরেকটি চৌবাচ্চা থাকতো। উপরের চৌবাচ্চায় পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হতো নীল গাছ। নয়-দশ ঘণ্টা পরে সমস্ত তরল পদার্থে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হতো। বুদ-বুদে ভরে যেতো পানির উপরের ভাগ। যেনো এক্ষুণি পানির ভিতর থেকে উঠে আসবে কোন জীনের বাদশাহ।

বুদবুদগুলো প্রথমে সাদা হতো। তারপর রং পাল্টাতে থাকতো। সবশেষে গাঢ় নীল রং হতো। পানি কিছুটা শান্ত হলে এর ওপর তামা রং-এর সর পড়তো। সে পানি গড়িয়ে নীচের চৌবাচ্চায় ফেলা হতো।

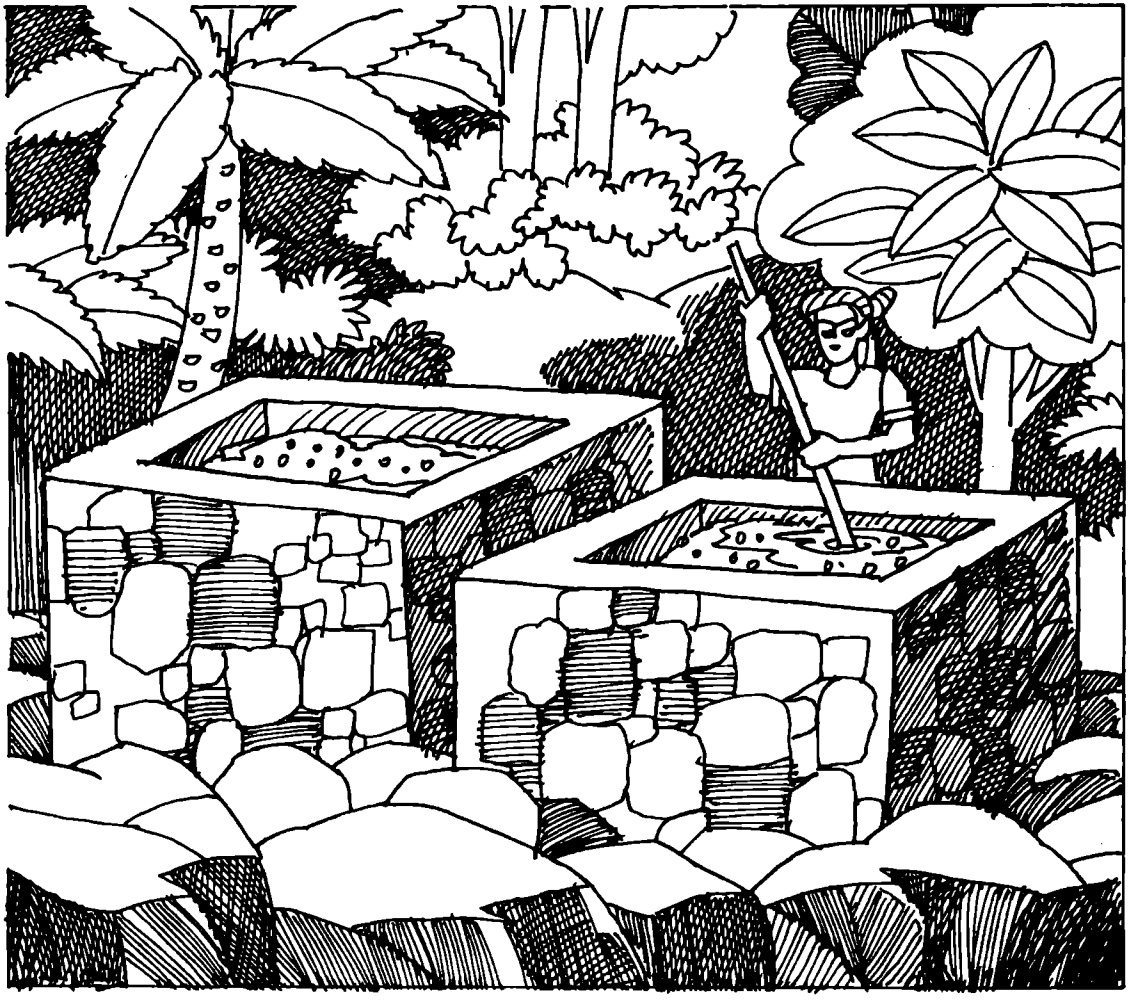

www.pathagar.com

পানি পিটিয়ে নীল

এবারে পানি পিটানোর কাজ। নীচের চৌবাচ্চায় পানি পিটানোর জন্য এক ধরনের হাতল ব্যবহার করা হতো। প্রায় দেড় ঘণ্টা পিটানোর পর আস্তে আস্তে তলায় গাদ জমতো। এভাবে চলতো আরো দু'তিন ঘণ্টা।

তার পর পানি সরিয়ে একজন লোক নামতো চৌবাচ্চায়। অপেক্ষাকৃত হাল্কা গাদ একটি পাইপের সাহায্যে অন্য একটি চৌবাচ্চায় গিয়ে পড়তো। এই পাত্রটির পাশে থাকতো একটি বয়লার বা চুল্লি। তাপ দেয়ার ফলে গাদের ওপর ভাসতো এক ধরনের তেলতেলে পদার্থ। অন্য একটি চৌবাচ্চায় মোটা পশমি কাপড়ে তা ছেঁকে নেয়া হতো।

পরের দিন সকালে সংগ্রহ করা হতো চুয়ানো নীল। এই নীল শক্ত ব্যাগে পুরে ব্যাগসহ চাপ দেয়া হতো। পরে সাবধানে নীল বের করে তিন ঘনফুট করে কেটে রোদে শুকানো হতো। রোদে শুকানোর সময় নীলের গায়ে সাদা পলি জমতো। ব্রাশ দিয়ে তা পরিষ্কার করা হতো। এই হলো নীল তৈরির মজার কৌশল।

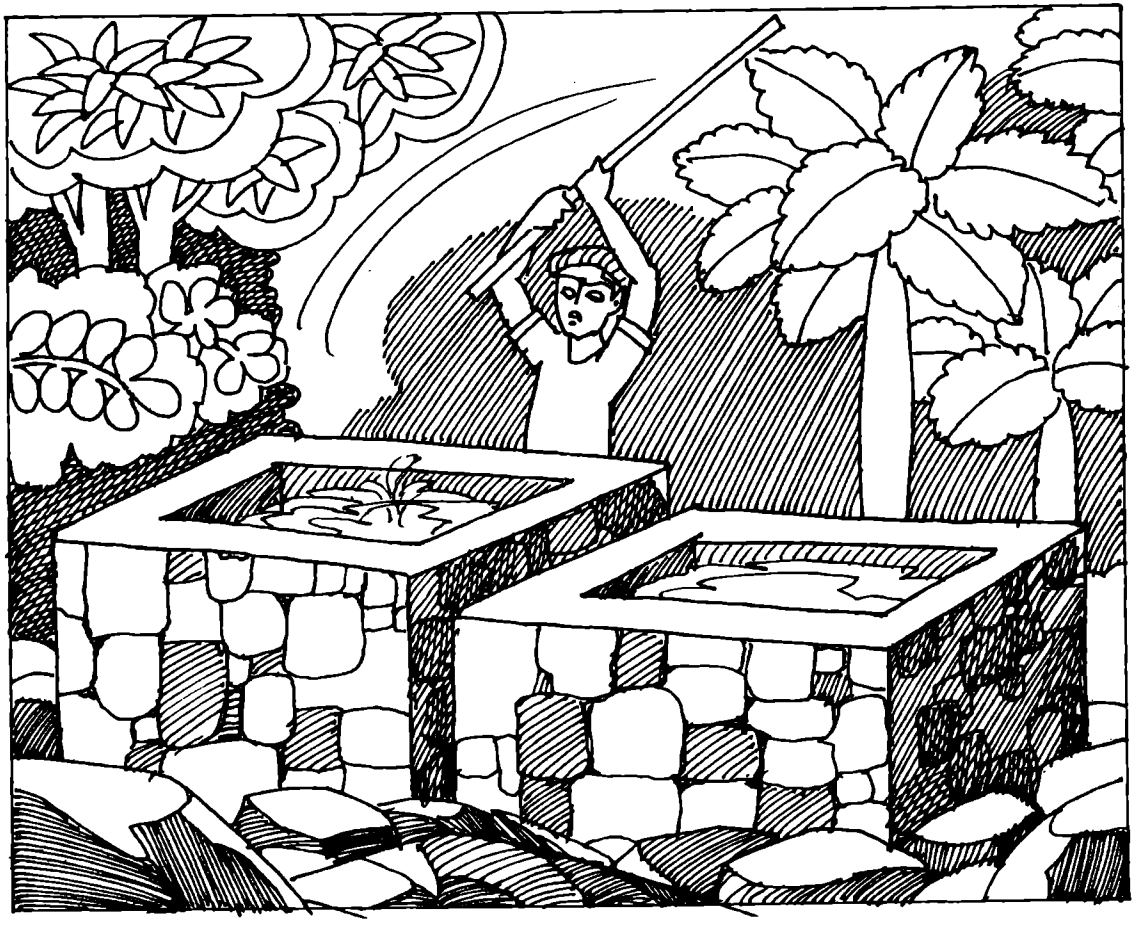

www.pathagar.com

নীলকুঠির কাহিনী

আগে ইংরেজরা নীল সংগ্রহ করতো ফ্রান্স ও স্পেন থেকে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বাংলাদেশের আযাদী কেড়ে নেয়। তারপর শুরু করে নানা প্রকার জুলুম-শোষণ। বেশী লাভের আশায় তারা এ দেশে নীলচাষের পরিকল্পনা করলো।

১৭৭৮ সালে এ দেশে প্রথম নীলকুঠি গড়ে তুললেন ক্যারেল ব্লুম নামক এক ইংরেজ। তারপর নীল-ব্যবসার প্রতি লোভী হয়ে উঠল আরো বহু লোক। এরপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সকল ইউরোপীয়কে বাংলাদেশে নীল চাষের অনুমতি দিল। কোম্পানী ১৭৮৮ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকজন নীলকরকেও বাংলাদেশে নীল ব্যবসার সুযোগ দিল।

www.pathagar.com

নীলকুঠির বিস্তার

১৭৯৫ সালে বন্ড নামক এক ইংরেজ যশোরের রূপদিয়া গ্রামে তার প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। এরপর তিনি কুঠি গড়েন যশোর জেলার অভয়নগর থানার আলীনগরে। ১৮৩৩ সালে যশোর জেলায় নীলকুঠির সংখ্যা ছিল ৩৩টি।

ঢাকা জেলায় ১৮০১ সালের মধ্যেই অনেক নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে নীলকুঠির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭টি। প্রত্যেক জেলায় প্রধান প্রধান নীলকুঠিকে বলা হতো 'কনসার্ন'। একেকটি কনসার্নের অধীনে অনেকগুলি নীলকুঠি থাকতো।

পাবনা জেলায় প্রতিটি কনসার্নের অধীনে পনেরো-ষোলটি কুঠি ছিল। পাবনাতে প্রতি চার-পাঁচ মাইল হাঁটলেই একেকটি নীলকুঠি চোখে পড়তো। ১৮৫৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় ৫০০ নীলকুঠি স্থাপিত হয়। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে নীল চাষ অনেক বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, মোমেনশাহী ও বরিশাল জেলা ছিল নীল চাষের প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশের একটি জেলার নাম নীলফামারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউমার্কেটের মাঝখানে একটি জায়গার নাম নীলক্ষেত। এমনি অসংখ্য নাম এক সময়কার নীলকুঠি আর নীল চাষের দুঃখময় স্মৃতি আজো ধরে রেখেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নীল ও বিলাতের শিল্প বিপ্লব

বাংলাদেশের সম্পদ লুঠ করেই ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়। কল-কারখানার প্রসার ঘটে। এসব কল-কারখানার কাঁচামাল হিসাবে কাঁচা চামড়া, পাট, কার্পাস ও নীল সংগ্রহ করা হতো বাংলাদেশ থেকে। সে-সব কাঁচামালে তৈরি জিনিসপত্র এনে আবার বিক্রি করা হতো বাংলাদেশে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়। বিলাতী কাপড় রং করার জন্য বাংলাদেশের নীলের চাহিদাও বাড়তে থাকে। ঊনিশ শতকের শুরুতে ইংল্যাণ্ডে ২০ লাখ পাউণ্ড নীলের দরকার হতো। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তখন তারা সংগ্রহ করতো ৪৫ লাখ পাউণ্ডেরও বেশী নীল।

১৮১৩ সালে ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৩০ লাখ পাউণ্ড নীল। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ থেকেই তারা এর পাঁচ গুণ নীল আহরণ করতো। বাড়তি নীল বিদেশে রফতানি করে ইংরেজরা আরো অ-নে-ক বেশী মুনাফা করতো।

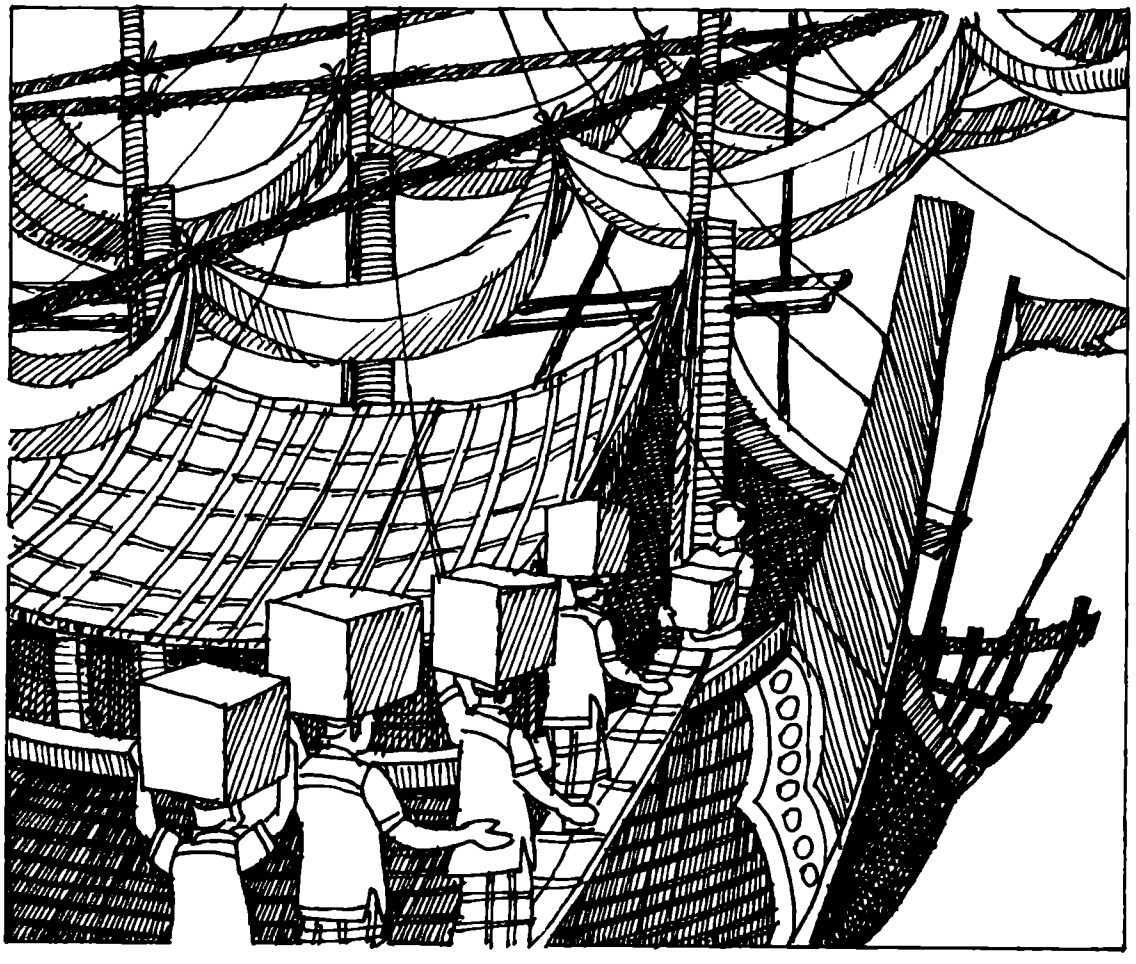

www.pathagar.com

নীল বানরের কালো দালাল

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে অনেক বড় বড় নীল কোম্পানী গড়ে ওঠে। ইংরেজরাই ছিল বেশীর ভাগ কোম্পানীর মালিক। নীলের চাষ অনেক লাভজনক। তাই কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে অনেক ইংরেজ নীল ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। চারটি নামকরা কোম্পানী ও বেশ কিছু নীলকুঠির মালিক ছিল এদেশী জমিদার।

তাদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত ছিলেন ঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। ইংরেজদের নানা রকম দালালী করেই এসব ব্যক্তি রাতারাতি ধনী হয়েছিলেন। তারাই ছিলেন ইংরেজদের শোষণের প্রধান সহায়ক।

www.pathagar.com

নীলের দাদন

নীল চাষের দু'ধরনের ব্যবস্থা ছিল।

এক ॥ নীলকররা নামে-বেনামে জমি সংগ্রহ করতো। সে জমিতে দু'-তিন টাকা মাসিক বেতনের শ্রমিক দ্বারা নীল চাষ করা হতো। এ ক্ষেত্রে নীল চাষের খরচ নীলকরদের বহন করতে হতো। এই পদ্ধতি নীলকরদের পছন্দ ছিল না।

দুই ॥ রায়ত বা চাষীদের এক বিঘা জমির জন্য মাত্র দুই টাকা দাদন বা আগাম দেয়া হতো। দাদনের এই টাকা থেকেই চাষীকে লাঙ্গল, গরু, সার, বীজ কিনতে হতো। নিড়ানী, গাছকাটা প্রভৃতি কাজ করতে হতো।

নীল গাছগুলো কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে যে টাকা কৃষকরা পেত তাতে তাদের লোকসান হতো তিন-চার গুণ। ফলে দাদনের টাকা কোনদিন তারা শোধ করতে পারতো না।

www.pathagar.com

আফ্রিকার ক্রীতদাস ও বাংলাদেশী 'নীল-দাস'

বাংলাদেশের নীল-চাষীদের অবস্থা আমেরিকার এককালের নিগ্রো ক্রীতদাসের চাইতেও শোচনীয় ছিল। আমেরিকার সাদা চামড়ার লোকেরা নিগ্রো ক্রীতদাস কিনতো চড়া দামে। কিন্তু ইংরেজ ও এদেশী নীলকররা নীলচাষী ও তার পুরো পরিবারকে কিনে নিত মাত্র দু'টাকা দাদনের বিনিময়ে।

নিগ্রো ক্রীতদাসরা কাজ করতো মালিকের জমিতে। চাষের লাভ-লোকসানের দায়িত্ব মালিকের। কিন্তু আমাদের দেশের 'নীল-দাস'রা কাজ করতো তাদের নিজের জমিতে। এ দেশের চাষীরা চাষ করতো নিজের ব্যয়ে। কিন্তু ফসল পেত নীলকর। সেই ফসল নীলচাষীরা নিজ খরচে কুঠিতে পৌঁছে দিতে বাধ্য ছিল।

আমেরিকার ক্রীতদাসদেরকে তাদের মালিকরা ভরণ-পোষণ দিতো। কিন্তু নীলকরদের সেবা করতে গিয়ে বাংলাদেশের নীল-দাসরা স্ত্রী-পুত্রসহ উপোস করতো।

www.pathagar.com

দেওয়ান ও গোমস্তাদের নির্যাতন

নীলকরদেরকে সাহায্য করতো একদল এদেশী কর্মচারী। এই কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে বলা হতো দেওয়ান। পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন পেতো তারা। এছাড়া দেওয়ানরা চাষীদের কাছ থেকে প্রতি এক টাকায় এক আনা বা আধা আনা কমিশন নিত।

দেওয়ানদের অধীনে ছিল ৫ থেকে ৯ টাকা বেতনের কেরানী বা রাইটার। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত এসব পদ লাভ করতো। নীল চাষ যারা তদারক করতো তাদের পদবী ছিল গোমস্তা। তাদের বেতন ছিল ১২ থেকে ২০ টাকা। গোমস্তাদের সহকারী থাকতো ৩ থেকে ৪ টাকা বেতনের ওভারসিয়ার। চাষী বা রায়তদের ওপর জুলুম করার জন্য কুঠিয়ালদের ছিল লাঠিয়াল বাহিনী। এই লাঠিয়ালরা বেতন পেত। এছাড়া তারা চাষীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা-পয়সা আদায় করতো।

www.pathagar.com

কুঠিয়ালের লাঠিয়াল ও 'শ্যামচাঁদ'

একবার নীলের দাদন নিলে সারা জীবন নীল চাষ করেও সে দাদনের চুক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতো না। কোন্ জমিতে নীল চাষ হবে, সেটাও নীলকররাই ঠিক করতো। নীল বোনার আগে ওই জমিতে অন্য কোন ফসল বুনতেও তারা পারতো না। নীলকররা সবচে' ভালো জমি নীলের জন্য বেছে নিত। গোমস্তারা এক বিঘা জমি মাপার নামে আড়াই বিঘা জমি নিয়ে নিত।

ছয় বাণ্ডেল নীল সরবরাহ করে কৃষক পেত দুই বাণ্ডেলের দাম। সে টাকা আবার অনেকটাই ভাগ হয়ে যেত নীল কুঠির গোমস্তা, আমিন আর তাগাদাদারদের মাঝে। এসব কারণে কোন চাষী সহজে নীল চাষে রাজী হতো না।

নীলকর কুঠিয়ালরা নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জুলুমের মাধ্যমে কৃষকদেরকে দাদনের চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করতো। এ জন্য চাষীদের ওপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো কুঠির লাঠিয়াল। যখন তখন তারা মানুষ খুন করতো। চাষীদেরকে মাসের পর মাস কুঠির গুদামে আটক রেখে অকথ্য অত্যাচার করা হতো।

নিরীহ নীল চাষীদের ওপর অত্যাচার করার জন্য চামড়া মোড়ানো 'শ্যামচাঁদ' নামক চাবুক ব্যবহার করা হতো। চাষীদের গরু-মহিষ আটক রেখে খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারা হতো। গুন্ডা দিয়ে জমির ফসল নষ্ট করে, বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নীল বুনতে বাধ্য করা হতো।

এই জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ক্ষমতাও নীলচাষীদের ছিল না। নীলকরদের কাছে আইন-আদালত, পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট সবাই ছিলেন অসহায়।

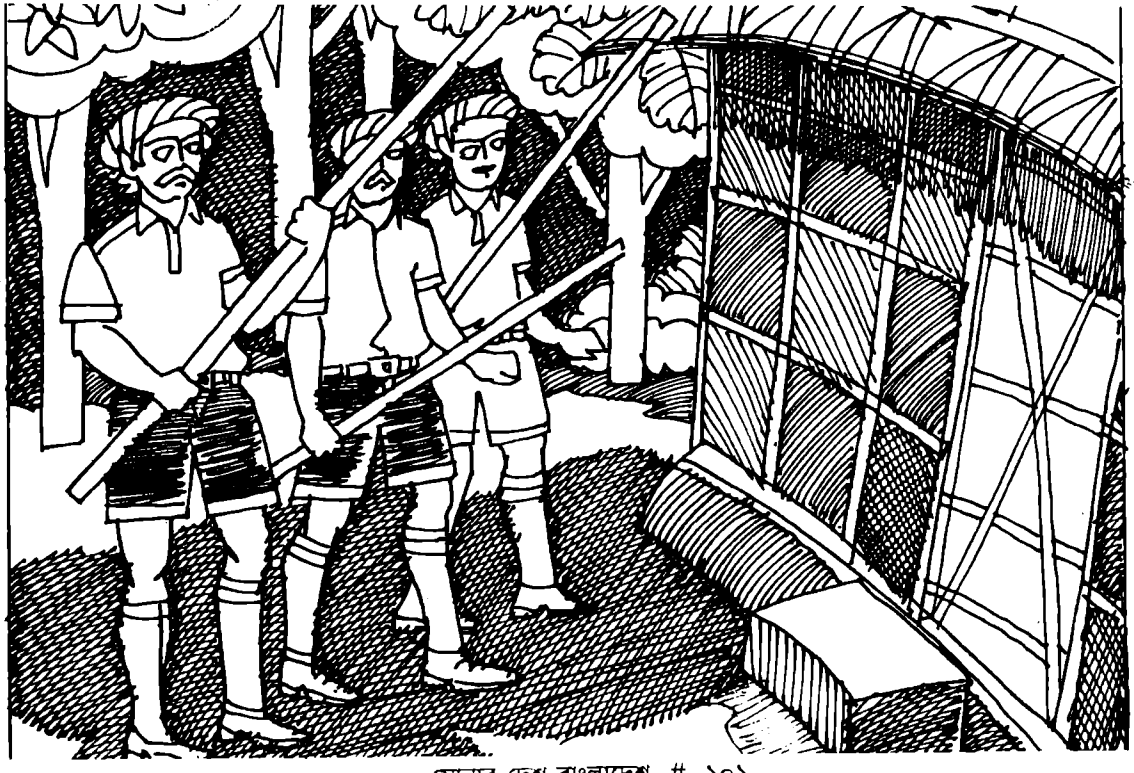

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতীফের বিচার

নীলকরদের জুলুম সইতে না পেরে একবার ক'জন নীলচাষী ঐক্যবদ্ধ হলেন। নীলকরদের জুলুম সম্পর্কে তারা যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ দায়ের করলেন। যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন এক মানব দরদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম আবদুল লতীফ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতীফ এ জন্য নীলকর হেনরী ম্যাকেঞ্জিকে পরোয়ানা পাঠালেন।

তিনি লিখলেন ঃ

"ফুল গ্রামের আসাদুল্লাহ মণ্ডল, গোলাপ মণ্ডল, জাকের মণ্ডল, তোতা গাজী এবং আকবর দফাদার এই আদালতে অভিযোগ করেছে যে, তোমার ফ্যাক্টরীর আমিন, খালাসী ও দেওয়ান লাঠিয়াল নিয়ে রায়তদেরকে নীল বুনতে ও দাদন নিতে বাধ্য করেছে। যারা দাদন দিতে রাজী নয় তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করেছে। তাদেরকে মারপিট করেছে। কাজেই এই পরোয়ানা মারফত তোমাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে তোমার লোকেরা যেন রায়তদের প্রতি আর অত্যাচার না করে। তাদের স্বাধীন চাষাবাদে যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। রায়তদের বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকলে তুমি তা আদালতে পেশ করতে পার। এই নির্দেশ অমান্য করলে তোমাকে গুরুতর জবাবদিহি করতে হবে।"

www.pathagar.com

বিচারের উল্টা ফল

এ পরোয়ানার ফল হলো উল্টো। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেক্রেটারীর কাছে পাল্টা অভিযোগ করলো হেনরী ম্যাকেঞ্জি। কর্তব্যে অবহেলার অজুহাতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতীফকে বদলী করে পাঠানো হলো জাহানাবাদে। এই হলো ইংরেজ কোম্পানীর বিচার !

এই আবদুল লতীফই মুসলমানদের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি পরবর্তীকালে নওয়াব আবদুল লতীফ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

www.pathagar.com

এত অত্যাচার, এত জুলুম করেও নীলকররা তৃপ্ত ছিল না। ১৮৩৫ সালে দু'শ' জন নীলকর ভারতের ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের কাছে এক দরখাস্ত করে। তাতে তারা লিখে যে, নীলচাষীরা সবাই ঠগ, শঠ, প্রতারক, মিথ্যাবাদী এবং অকর্মন্য। কাজেই কোটি কোটি টাকা খাটিয়েও বেশী লাভ করা যাচ্ছে না। নীলকরদের আরো অভিযোগ, পুলিশ কিংবা আদালতও না-কি তাদের এই ব্যবসায় খুব বেশী সাহায্য করছে না।

নীলকরদের এই অভিযোগ ছিল সত্যের বিপরীত। এই মিথ্যুক জালিম দরখাস্তকারীরা সবাই ইংরেজ ছিল না। কয়েকজন ছিল এদেশী নীলকর জমিদার। তাদের মধ্যে সবচে' নামী ব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই দ্বারকানাথ ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের দালালী করে কলকাতার একজন বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। জনগণকে শোষণ করতে তারা ছিলেন ইংরেজদের চাইতে বেশি সেয়ানা ও চালাক।

www.pathagar.com

পুলিশ অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেটের চোখের সামনেই নীলকরদের লাঠিয়ালরা চাষীদের জমি দখল করে নিত। খুন-খারাবি করতো। নীলকরদের এই অত্যাচার সম্পর্কে ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য দেন নীল কমিশনের কাছে। তিনি বলেন ঃ

এমন এক-বাক্স নীলও ইংল্যাণ্ডে যায় না, যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়।

www.pathagar.com

গর্জে ওঠেন মজনু শাহ

সব কিছুরই একটা শেষ আছে। নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধেও সারাদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সব জায়গায় হলো প্রতিরোধ। পাবনা ছিল নীল বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে বাংলার কৃষকরা লড়াই করলেন নীলকরদের বিরুদ্ধে।

নীল চাষীদের বিদ্রোহ রূপ নিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহ। ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে পরিচালিত ফকির বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল আরো অনেক আগে। সে বিদ্রোহের শুরু হয় নীলকরদের ঢাকা কুঠির ওপর হামলার মাধ্যমে। মজনু শাহের নেতৃত্বে আরো অনেক হামলা হয়েছিল নীলকুঠির ওপর।

www.pathagar.com

তিতুমীরের প্রতিরোধ

তিতুমীর পরিচালনা করলেন জিহাদ আন্দোলন। ইংরেজ ও তার এ দেশী দালালদের জুলুম থেকে এ দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন তিতুমীর। নীলকরদের পরিচালিত নীল কুঠিগুলো ছিল তিতুমীরের হামলার লক্ষ্য। বহু নীলকর তিতুমীরের হামলার ফলে কুঠি এবং নীলের চাষ ছেড়ে জান নিয়ে পালিয়েছিল। তিতুমীরের বাহিনীর কাছে নীলকররা বহুবার পরাজিত হয়েছে।

এভাবে নীল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। দীর্ঘদিন তা স্থায়ী হয়। কুঠিয়াল আর বিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল গুরুতর। সেই গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতে বড়লাট ক্যানিং এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ *দিল্লীতে সিপাহী বিদ্রোহের পুরো সময়টাতে আমি যতটা উদ্বিগ্ন ছিলাম, বাংলাদেশে নীলচাষীদের এক সপ্তাহের বিদ্রোহ আমাকে তারচে' বেশী উদ্বিগ্ন করে রাখে।*

তারপরও দীর্ঘদিন চলে নীলকরবিরোধী সংগ্রাম।

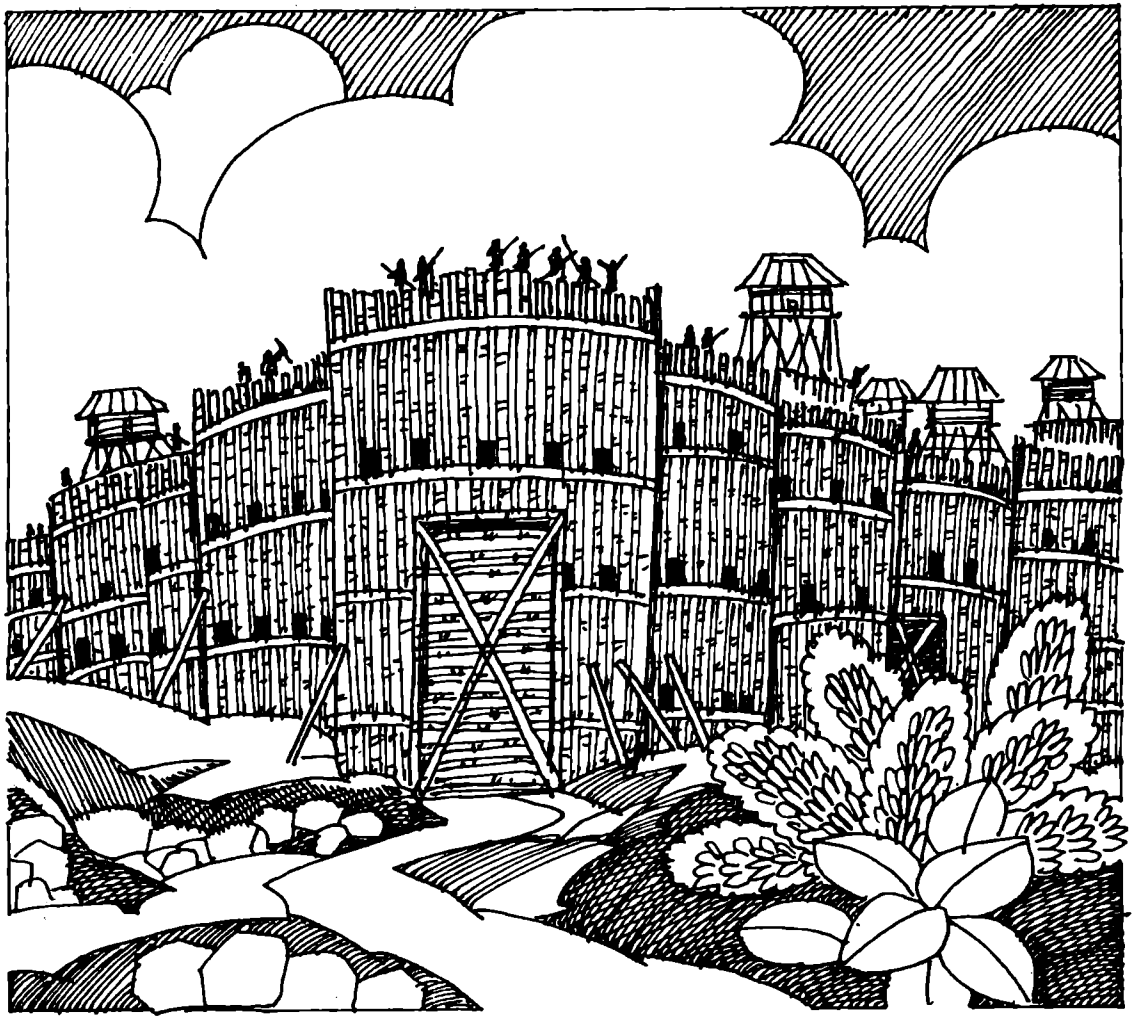

www.pathagar.com

নীল বিদ্রোহী সাদেক মোল্লা

পদ্মা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-ভাগিরথি-দোয়াব নদীর তীর ঘেঁষে নীল বিদ্রোহ সারাদেশকে তখন করে তুলছিল টালমাটাল। এ সময় পল্লীর এক নাম না জানা কবির কবিতা থেকে জানা যায় সাদেক মোল্লা নামক একজন নীল-বিদ্রোহীর কথা ঃ

'গুলিগোল্যা সাদেক মোল্লা
রেনীর দর্প করলে চূর'

এ ধরনের কত সাদেক মোল্যা তখন বুক টান করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন নীলকরদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ চাষী মুসলমান। তাই নীল বিদ্রোহে মুসলমানদের অংশই ছিল বেশী। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আত্মরক্ষার এই সংগ্রামে শরিক ছিলেন মুসলমানদের সাথে।

আরেক নাম না-জানা পল্লী কবির এ গান থেকে জানা যায় কৃষক নেতা ছালু সরকারের প্রতিরোধের কথা ঃ

ড্যামরায় আছে ছালু সরকার
করতে দেয় না নীলের কারবার
লাঠি মারে ড্যামরার পচা রায়।

উনিশ শতক শেষ হবার আগেই বাংলাদেশের নীল বিশ্বের বাজারে তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছিল। দখল করেছিল শ্রেষ্ঠত্বের আসন। কিন্তু সে ব্যবসা ছিল বিদেশী বণিকদের কুক্ষিগত।

বিদেশীরা আমাদের সম্পদ লুট করে ফুলে-ফেঁপে উঠল। বিনিময়ে আমাদের চাষীরা পেল জুলুম আর বঞ্চনা। দুঃখ আর অবর্ণনীয় দুর্দশা।

নীল-চাষীদের দুঃখের কাহিনী নিয়ে চারণ কবিরা রচনা করেছেন অনেক প্রবাদ। এখনো গাঁয়ের মাঠে, ধান-পাট-সরিষা জমির আইলের কিনারে কান পাতলে শুনা যায় ঃ

জমির শত্রু নীল
কাজের শত্রু ঢিল।

www.pathagar.com

মসলিন ও রেশমের যাদু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কার্পাস থেকে কাপাসিয়া

ভাওয়ালের জঙ্গল ঘেরা কাপাসিয়া। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানা। কার্পাস উৎপাদনের প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল এই লাল মাটির এলাকা কাপাসিয়া। বাংলাদেশেই প্রথম শুরু হয় কার্পাস তূলার চাষ। কার্পাস থেকেই কাপাসিয়া। কার্পাস আর কাপাসিয়া। পিঠাপিঠি নাম।

দুনিয়ার সব দেশে তখন শিল্প বলতে বোঝাতে হস্ত শিল্প আর কুটির শিল্প। সে যুগে বাংলাদেশ ছিল সেরা শিল্পায়িত দেশ। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ছিল দুনিয়ার সেরা। বাংলাদেশের তাঁতীরা ছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর। সেরা শিল্পী।

কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, ইতিহাস গ্রন্থ পেরিপ্লাস, আরো কত প্রাচীন বই-পুস্তকে লেখা আছে আমাদের বস্ত্রের খ্যাতি।

আট শতকের আরব বণিক সোলায়মান। দশ শতকের আরব লেখক খোরদাদ্‌বা। তেরো শতকের পর্যটক মার্কোপোলো। পনেরো শতকের চীনা পরিব্রাজক মাহুয়েন। ষোল শতকের রালফফিচ। সবার মুখে মুখে আমাদের কাপড়ের যশ।

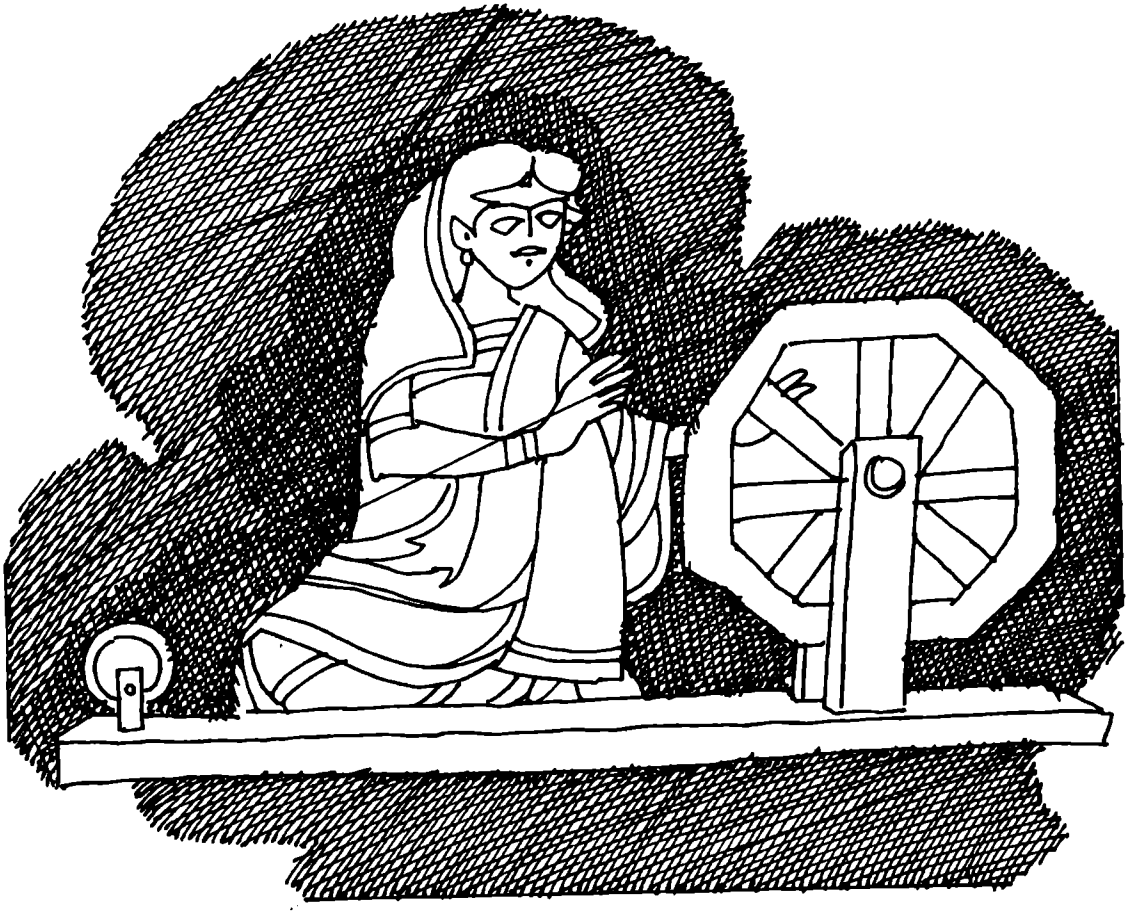

www.pathagar.com

মিসরের পিরামিডে ঢাকাই মসলিন

ঈসা (আঃ)-এর জন্মেরও দু'শ' বছর আগের কথা। আমাদের দেশের সূতী কাপড় তখন গ্রীসের বাজারে বিক্রি হতো। গ্রীসের যুবকদের কাছে ঢাকার 'ঝনা' মলমল প্রিয় ছিল খুব। মলমল মানে মসলিন।

এদেশের কাপড় তখন রফতানী হতো আরব ও ইরানে। প্রাচীন আসিরিয়া, বেবিলন কিংবা রোম। ঢাকাই মসলিন প্রিয় ছিল সবখানে।

আমাদের মসলিনে জড়ানো মমি পাওয়া গেছে পিরামিডের দেশ মিসরে। পাহাড়ের ভেতর প্রাচীন কবরে।

সূক্ষ্ম মসলিন কিংবা শীত নিবারণী মোটা চাদর। সব কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল বাংলাদেশ।

এদেশের প্রায় সব জেলাই কোন না কোন কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। সবচে' বেশী সুনাম ছিল ঢাকাই মসলিনের। মসলিন ছিল দুনিয়ার বিস্ময়। মসলিনের পাশে রাখার মতো কাপড় আজো কোথাও তৈরি হয়নি। বিদেশীরা অবাক হয়ে এ কাপড়ের নাম দিয়েছিল 'হাওয়াই ইন্দ্রজাল'।

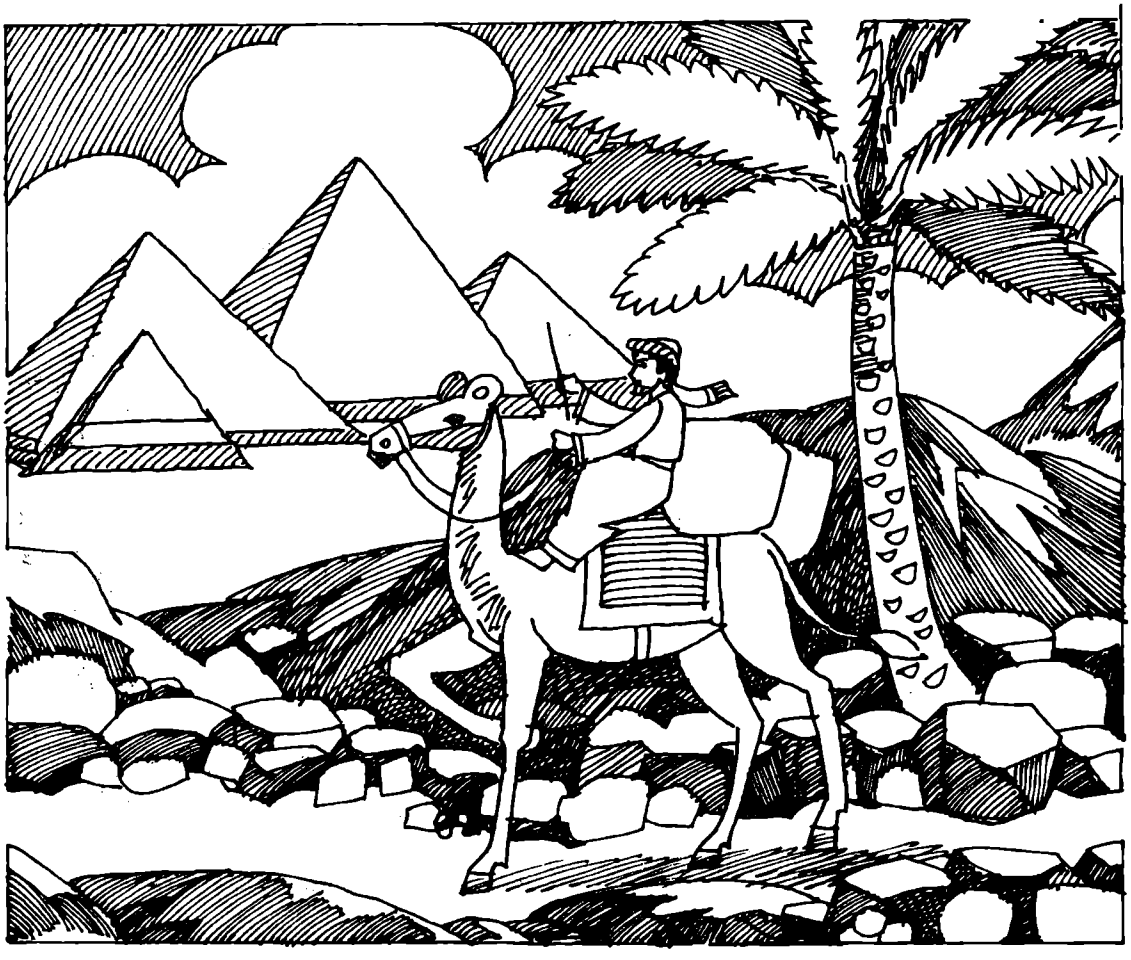

www.pathagar.com

হাতেতে লইলে শাড়ী মুইষ্টেতে মিলায়

ষাট হাত দীর্ঘ একটি মসলিন কাপড় হাতে রাখলে সহজে টের পাওয়া যেতো না। 'মলমল খাস' নামক মসলিনের সূতা ছিল মাকড়সার জালের আঁশের চেয়ে সূক্ষ্ম। ১৭৫ হাত সূতার ওজন ছিল মাত্র এক রতি। এক পাউণ্ড ওজনের সূতা লম্বায় ছিল আড়াইশ' মাইল।

'আবরোঁয়া' নামক মসলিন পানিতে রাখলে খুঁজে পাওয়া যেত না। সোনার গাঁওয়ের ১৭৫ হাত দীর্ঘ একটি মসলিন কাপড়ের ওজন হয়েছিল মাত্র চার তোলা। দুই হাত চওড়া ও চল্লিশ হাত দীর্ঘ একটি 'ঝনা' মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে আট আউন্স। তিন হাত চওড়া আর কুড়ি হাত দীর্ঘ 'বদন খাসা' মসলিন কাপড়ের ওজন ছিল দেড় থেকে দুই আউন্স। ষাট হাত দীর্ঘ একটি কারুকাজ করা মসলিন কাপড় একবার নারিকেলের ছোট খোলে ভরে পাঠানো হয়েছিল ইরানের শাহী দরবারে।

নবাব আলীবর্দী খাঁ পরীক্ষা করার জন্য 'শবনম' নামক এক খণ্ড মসলিন একবার শুকাতে দিয়েছিলেন ঘাসের ওপর। সে কাপড় ঘাসের সাথে চলে যায় গরুর পেটে।

মসলিন শাড়ী সম্পর্কে এমন হাজারো কাহিনী আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। মসলিন সম্পর্কে আমাদের দেশের এক নাম না জানা কবি লিখেছেন ঃ

হাতেতে লইলে শাড়ী
মুইষ্টেতে মিলায়।
মিরতিকাতে লইলে শাড়ী
পিঁপড়ায় লইয়া যায়।

অর্থাৎ মসলিন শাড়ি হাতে নিলে তা মুঠিতে এঁটে যায়। মৃত্তিকা বা মাটিতে রাখলে তা পিঁপড়ায় নিয়ে যায় !

www.pathagar.com

মাকড়সা পরীর কাজ

বিদেশীরা আমাদের শাড়ী দেখে অবাক হয়ে বলেছেন, এ কাপড় তৈরি কোন মানুষের সাধ্য নয়। মাকড়সার মতো কোন কীটপতঙ্গ বা কোন পরীর পক্ষেই সম্ভব এ কাজ।

মসলিন তৈরিতে আমাদের তাঁতীদের কোন জটিল যন্ত্রপাতি লাগতো না। কয়েকটি কাঠ আর কয়েকটি দড়ি। তাই দিয়ে বানানো হতো খুব সাধারণ তাঁত। সে তাঁতে তারা তৈরি করতেন বিদেশীদের চোখ ধাঁধানো 'হাওয়াই ইন্দ্রজাল'।

আমাদের তাঁতীরা ছিলেন নিপুণ শিল্পী। সুদক্ষ কারিগর। চোখের আন্দাযে তারা বলে দিতেন সূতার সূক্ষ্মতা আর ওজন। তাদের ছিল অসাধারণ স্পর্শ জ্ঞান। ছিল তীক্ষ্ণ অনুভূতি। আর ছিল সমান তালে পা চালানোর নিখুঁত ছন্দ।

ওর্মে নামক এক ইংরেজ লেখক বলেছেন, ইউরোপের তাঁতীরা এত সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে মসলিন দূরে থাক, চটও তৈরি করতে পারতো না।

মসলিনের স্বর্ণযুগ ছিল মুসলিম শাসনকাল। সম্রাজ্ঞী নূর জাহান। সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁদের আমলে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে মসলিনের কদর বাড়ে। সম্রাট শাহজাহানের সময় মসলিন ছিল দিল্লীর দরবারের আমীর-ওমরাহদের লেবাস। আওরঙ্গজীবের আমলেও মসলিনের সে কদর বহাল ছিল দিল্লীর দরবারে।

www.pathagar.com

রেশম নিয়ে তোলপাড় রোম

অনেক অনেক দিন আগে বাংলাদেশে রেশমের চাষ শুরু হয়। রেশম উৎপাদন শুরু করে 'সিরিজ' নামক এক প্রাচীন জাতির লোক। গুটিপোকার লালা থেকে তৈরি হয় রেশম। সৃষ্টির এ এক মহাবিস্ময়।

টলেমী, পম্পোনিয়াম, মিলা, প্লীনি, পওসোনিয়ামের মত প্রাচীনকালের নাম-দামি বিদেশী লেখকগণ লিখেছেন আমাদের রেশম শিল্পের কথা। রেশম উৎপাদনকারী সিরিজ জাতির কথা।

জেমস টেলর নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক প্রমাণ করেছেন, এই সিরিজ জাতির লোকেরা ছিলেন রংপুর জেলার তিস্তা পারের আদিম বাসিন্দা। তারাই কয়েক হাজার বছর আগে রেশম গুটি আবিষ্কার করেন।

রেশমী বস্ত্র প্রাচীনকালে এদেশে পরিচিত হয় 'পাটের কাপড়' বা 'পট্ট বস্ত্র' নামে। কলাপাট, অগ্নিপাট, কাঞ্চাপাট। আরো কত রেশমী কাপড়। গঙ্গাজলী, ময়ূরপেখম, আসমানতারা। অগ্নিকূল, হিরামন, মাঞ্জাকুল, কামরাঙ্গা। বাহারি কত আদুরে নামে পরিচিত হয়েছে আমাদের রেশমী শাড়ী।

আমাদের রেশমী কাপড় রফতানী হতো দুনিয়ার নানা দেশে। রেশম উৎপাদনের অদ্ভূত কৌশল পাশ্চাত্যে অজানা ছিল বহু দিন। রেশম সম্পর্কে ছিল অনেক উদ্ভট কল্পনা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মেরও আগের কথা। সে সময় রেশমী পোশাক রোমে খুবই জনপ্রিয় ছিল। বাংলাদেশের রেশম রোমে নিয়ে যেতো ইরানী বণিকরা। জাস্টিনিয়ান ছিলেন তখন রোমের সম্রাট।

রেশমের দাম ছিল খুব চড়া। এত চড়া দামে লোকেরা রেশম কিনুক—এটা পছন্দ ছিল না সম্রাট জাস্টিনিয়ানের। তিনি তার দেশে রেশম আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। নির্দেশ জারী করলেন ঃ এক পাউণ্ড রেশম আট স্বর্ণ মুদ্রার বেশী দামে বেচা-কেনা চলবে না।

তাতেও কাজ হলো না। বেড়ে গেল রেশমের চোরা কারবার। সম্রাট রেগে গেলেন। তিনি ইরানীদের কাছ থেকে রেশম ব্যবসা নিজের হাতে নিতে চাইলেন।

সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। সম্রাট রেশমের উপর আরো নাখোশ হলেন। রোম সম্রাজ্ঞী একটি রেশমী কামিজ কিনতে চেয়েছিলেন। তাও তিনি কিনে দিলেন না। এভাবে লোকদের চাহিদা দমানো গেল না। সম্রাট ধরলেন ভিন্ন পথ।

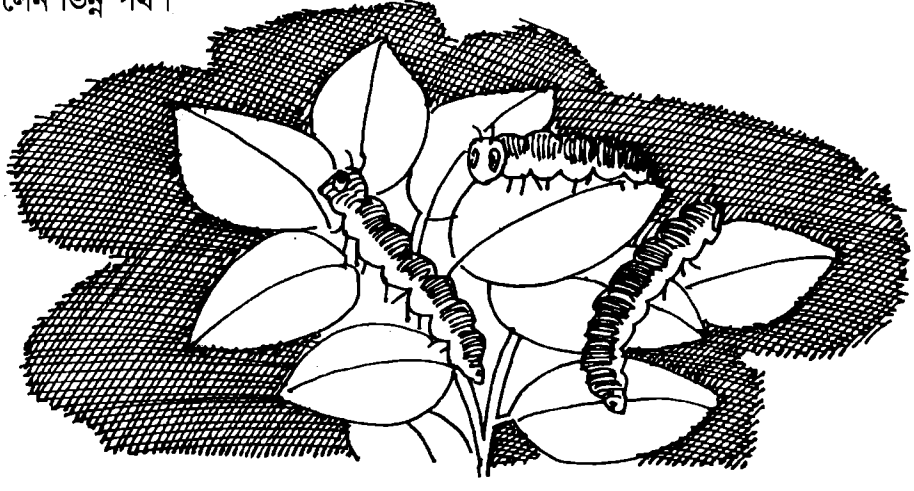

www.pathagar.com

লাঠির ভিতর রেশম পোকার ডিম

সে সময় দু'জন ইরানী ধর্মযাজক রংপুরে এলেন। তারা বহু দিন বাস করলেন রংপুরে। রেশম সম্পর্কে তারা জেনে নিলেন নানা তথ্য। নানা নিয়ম-কৌশল।

তারপর ফিরে গেলেন রোমে। রোমের রাজধানী তখন কনস্টান্টিনোপল। মানে ইস্তাম্বুল। সেখানে গিয়ে তারা সম্রাটের কাছে প্রকাশ করলেন রেশম তৈরির রহস্য। অনেক পুরস্কার পেলেন তারা।

এভাবেই রোমে পাচার হলো গুটি পোকা থেকে রেশম তৈরির কৌশল। সম্রাটের আদেশে সেই দুই ইরানী ধর্মযাজক আবার ফিরে এলেন রংপুরে। সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা ফাঁকা লাঠির ভিতর রেশম পোকার ডিম ভরে নিলেন। তারপর ফিরে গেলেন রোমে।

রংপুর থেকে রোমে রেশম প্রযুক্তি পাচারের সে ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান। এ ঘটনা ৫৫২ সালের। এরপর একে একে বহু দেশ জেনে গেল রেশম তৈরীর কায়দা-কানুন। কিন্তু সে জন্য লেগেছিল দীর্ঘ সময়।

ইংল্যাণ্ডে রেশমী কাপড় তৈরি শুরু হয় আরো হাজার বছর পরে। ১৪৫৪ সালের আগ পর্যন্ত ইংরেজরা রেশমী কাপড় তৈরির কৌশল জানতো না।

www.pathagar.com

বিলাতী বাজারে বাংলাদেশী বস্ত্র

বস্ত্র শিল্পে দুনিয়ার সেরা দেশ বাংলাদেশ। বিখ্যাত মুগল সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময় পর্যন্ত ছিল আমাদের কাপড়ের সোনালী দিন।

১৬৬৬ সালের কথা। সে বছর ইংরেজ বণিকেরা ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। তারা আমাদের সূতী কাপড় রফতানী শুরু করে বিলাতী বাজারে। সেদেশে আমাদের কাপড় নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।

আগে বিলাতীরা পরতো পশমী কাপড়। পশমী কাপড় সূতী বস্ত্রের মতো আরামদায়ক নয়। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা সূতী কাপড়ের প্রতি ঝুঁকে পড়লো। মাত্র দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কাপড় বিলাতের বাজার পুরোপুরি দখল করে নেয়।

www.pathagar.com

ভেড়ার গাছে জন্মে পিরান

আজকের ম্যানচেষ্টার আর ল্যাঙ্কাশায়ারের দেশ ইংল্যাণ্ড। বয়ন শিল্পে এখন দুনিয়া জোড়া খ্যাতি তাদের। কিন্তু তখন তারা আমাদের শিল্পের তুলনায় কিছুই ছিল না। আমাদের সূতী কাপড় ইংল্যান্ডে পৌঁছার আগে সূতা সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণা ছিল উদ্ভট আর হাস্যকর।

ওয়াটসন নামক একজন ইংরেজ লেখক সে হাস্যকর ধারণা সম্পর্কে জানাচ্ছেন ঃ ইংরেজরা মনে করতো বাংলাদেশের সূতী কাপড় ভেড়ার পশম থেকে তৈরী। তবে তা যেমন-তেমন ভেড়া নয়। সে ভেড়া গাছে জন্মে!

তারা মনে করতো ঃ বাংলাদেশে এক জাতের গাছ আছে। সে গাছে প্রচুর ভেড়া বা মেষ উৎপাদিত হয়। সে ভেড়ার পশম খুব চমৎকার ও মোলায়েম। সে পশম থেকে তৈরী হয় আরামদায়ক মিহি কাপড়।

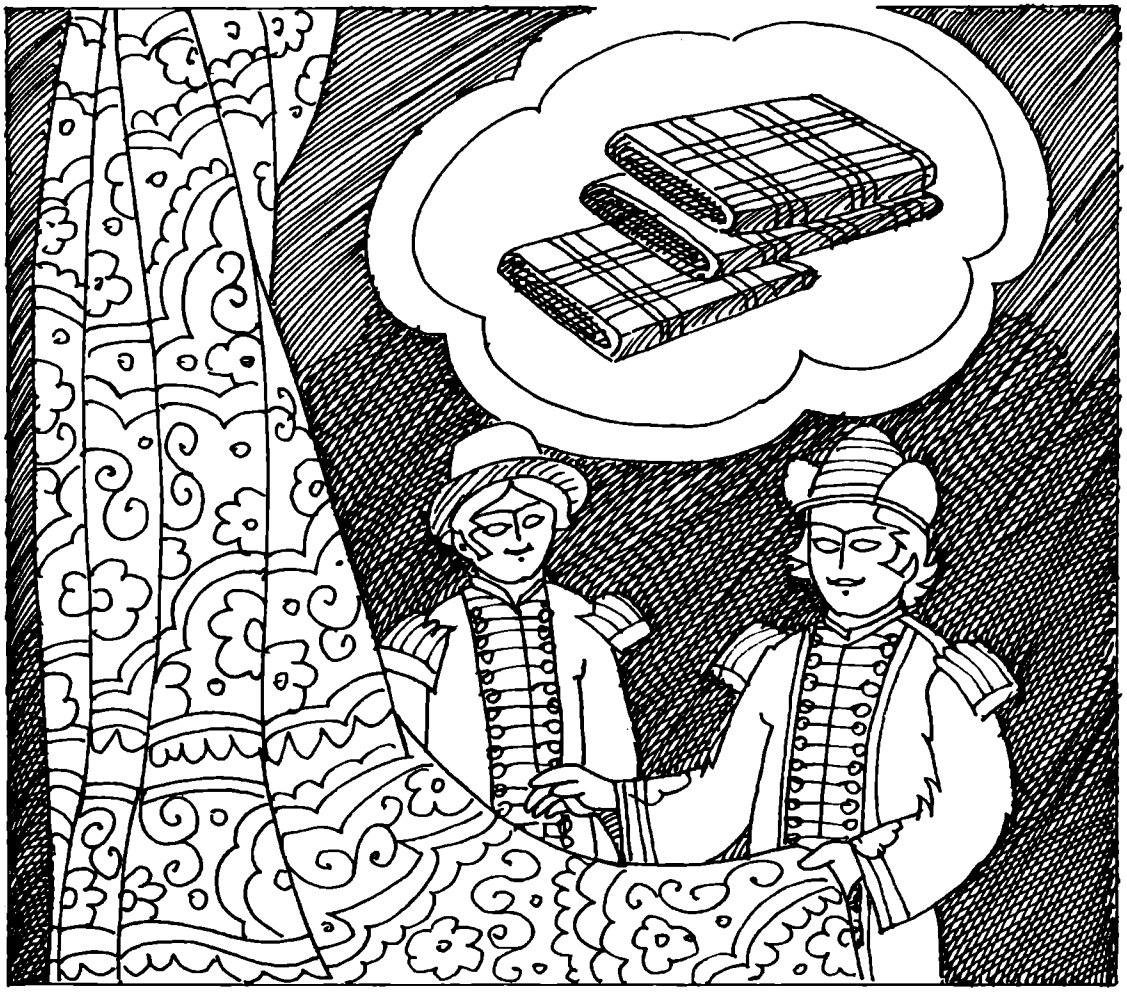

www.pathagar.com

ঢাকাই কাপড় বর্জন কর

আমাদের সূতী কাপড়ের কাছে দশ বছরের মধ্যে হার মানলো বিলাতী পশমী কাপড়। পশমী কাপড়ের ব্যবসায়ীরা শুরু করলো আন্দোলন। আমাদের কাপড়ের বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান দিল ঃ 'ঢাকাই কাপড় আমদানী বন্ধ কর। ঢাকাই কাপড় বর্জন কর।'

বিলাতের সরকার ১৭০০ সালে পার্লামেন্টে আইন পাস করলো। সে দেশে আমদানী বন্ধ হলো ঢাকাই কাপড়।

এখন তো আমাদের দেশে মাঝে-মধ্যেই শুনি বিদেশী পণ্য বর্জনের দাবি। বিলাতী পণ্য বর্জনের দাবিতে কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। এখন মাঝে মধ্যেই শুনি ভারতীয় পণ্য বর্জনের দাবি। তেমনি দেশী শিল্প রক্ষার জন্য বিলাতীরা এক সময় আওয়াজ তুলেছিল ঢাকাই পণ্য বর্জন কর।

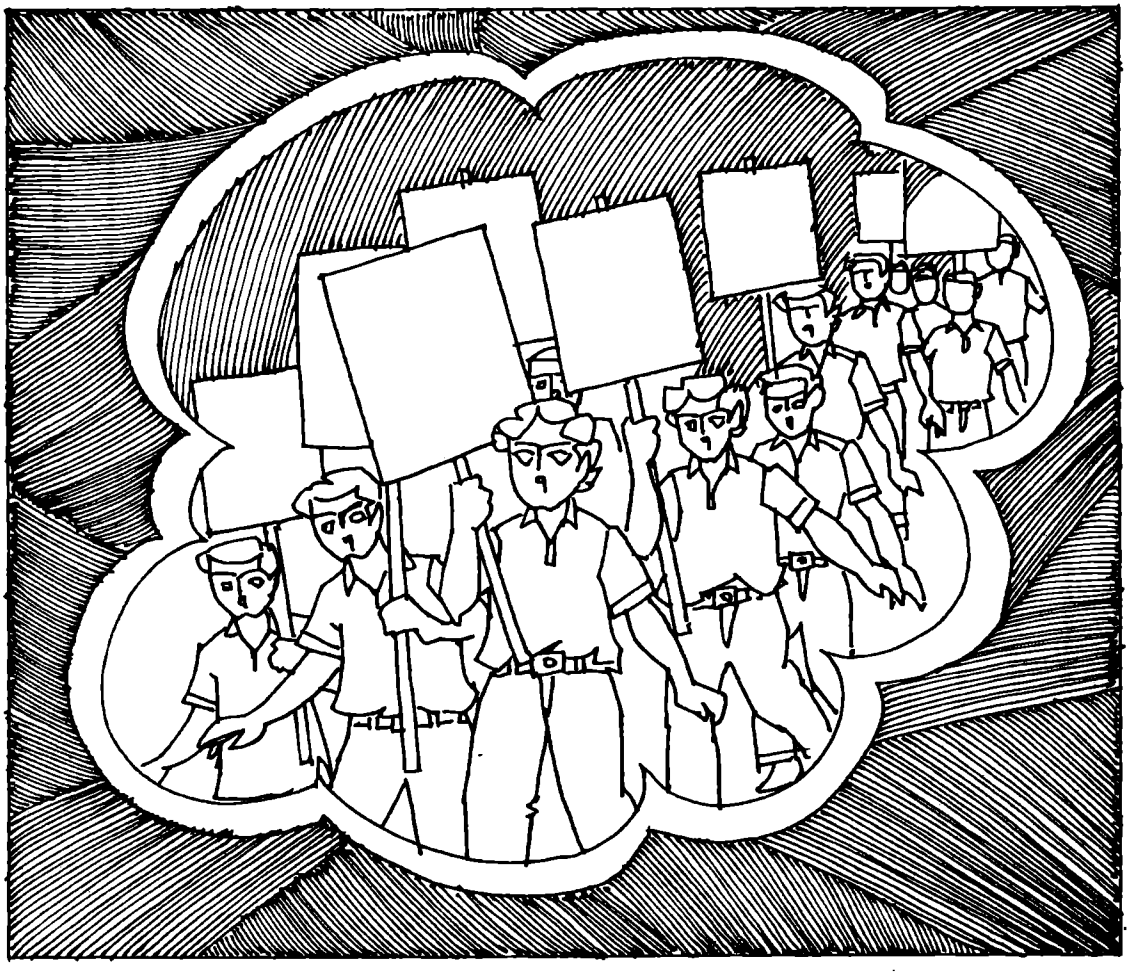

www.pathagar.com

তাঁতী যায় বনে

১৭৫৭ সালে পলাশীতে যুদ্ধের নামে প্রহসন ঘটলো। ইংরেজরা দখল করলো বাংলাদেশ। আমরা হলাম পরাধীন। তারপর রাতারাতি পাল্টে গেল আমাদের শিল্পের অহংকার। ইংরেজ আমলে এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের পণ্যের বাজার বন্ধ হলো। আমাদের কাপড় রফতানী থেমে গেলো।

মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের বস্ত্র শিল্পে সৃষ্টি হয়েছিল সোনালী যুগ। পরাধীন দেশে সে গৌরব আর থাকলো না। ইংরেজরা তাঁতীদের ওপর অত্যাচার চালালো। জোর করে কম দামে কাপড় তৈরিতে বাধ্য করলো। ইংরেজদের দাদনের অত্যাচারে বহু তাঁতী কাপড় তৈরির কাজ ছেড়ে দিলেন। তারা জঙ্গলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

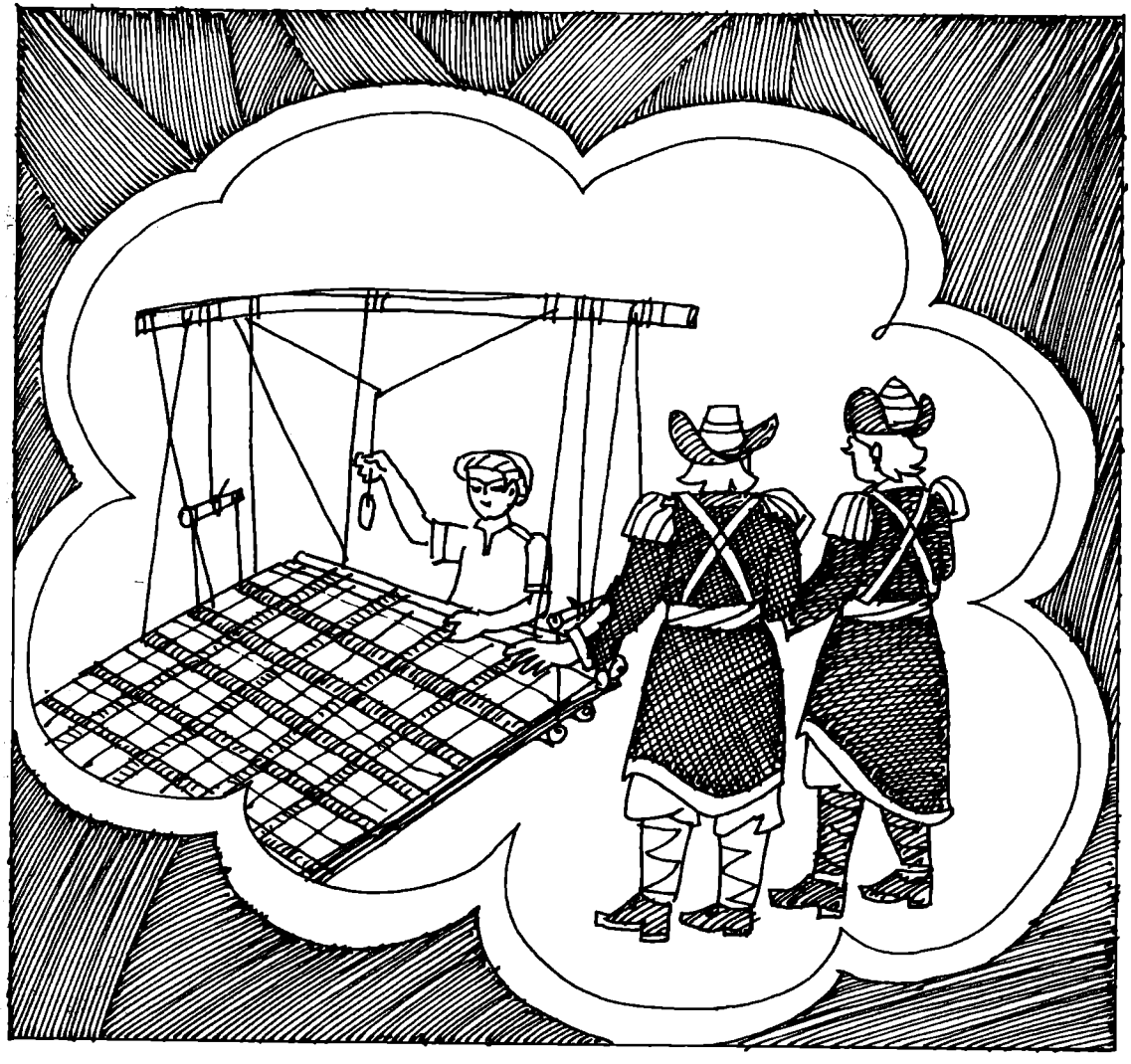

www.pathagar.com

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও আঙ্গুল কাটা তাঁতী

ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে ১৭৫৭ সালে। তাদের সাথে হাত মিলায় কিছু এদেশী লোক। কলকাতা ছিল তাদের কেন্দ্র। তারা সারা বাংলায় শোষণ চালায়। জুলুম-অত্যাচার করে। মানুষের সম্পদ কেড়ে নেয়। কলকাতা তখন কোন শহর ছিল না। ছিল জলা জঙ্গল। সারা বাংলার সম্পদ লুট করে কলকাতায় রাতারাতি শহর গড়ে ওঠে। এই শোষণের ফলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। সে দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু ঘটে।

সেটা ছিল বাংলা ১১৭৬ সালের ঘটনা। এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। সে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু তাঁতীর মৃত্যু হলো। এভাবেই আমাদের বস্ত্র শিল্পে নেমে এলো বিপর্যয়। ইংরেজদের সে অত্যাচারের কাহিনী আজো ছড়িয়ে আছে মানুষের মুখে মুখে।

সিদ্ধিরগঞ্জ, কাঁচপুর, বালিয়াপাড়া। চরপাড়া, নবীগঞ্জ, তিতবরদী। ডেমরা, নোয়াপাড়া, মৈকুলী। বাজারক, বাঁশটেকী, শাহপুর, ধামরাই। সেকালের ঢাকার মসলিন উৎপাদনকারী বিখ্যাত গ্রাম। এ সব গ্রামে কান পাতলে আজো শোনা যাবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া বয়ন শিল্পীদের কান্নার আওয়াজ।

ইংরেজরা বাংলাদেশের তাঁতীদেরকে বিনা পয়সায় মসলিন তৈরি করতে বাধ্য করতো। এ কারণে অনেক তাঁতী নিজের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে এ জুলুম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন।

www.pathagar.com

চরকা চালু ছিল আমাদের ঘরে ঘরে। আমাদের চরকায় কাটা সূতা ছিল অতুলনীয়। সে সূতা বিলাতেরও চাহিদা মিটাতো। ১৭৮৬ সাল থেকে বিলাতে সূতা রফতানী বন্ধ হয়। এরপর ইংল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে সূতা আমদানী শুরু হয়।

১৮২৪ সালে ঢাকায় আসে বিলাতী সূতার প্রথম চালান। আঘাত এলো আমাদের চরকা শিল্পের ওপর। ১৮২৮ সাল থেকে আমাদের দেশেও বিলাতী সূতায় কাপড় তৈরি শুরু হয়। ১৮৪০ সালের মধ্যে বিলাতী সূতা পুরোপুরি দখল করে এদেশী বাজার।

ইতিহাসের এ-এক আশ্চর্য ঘটনা। ইংল্যান্ডের লোকেরা এক সময় মনে করতো আমাদের গাছে ভেড়া উৎপন্ন হয়। সে ভেড়ার পশমে সূতা তৈরি হয়। বাংলাদেশ দখল করে তারা কেড়ে নিলো আমাদের শিল্পের বড়াই। সতেরো শতকের শেষের দিকে ইংরেজদের শ্লোগান ছিল ঃ 'ঢাকাই কাপড় বর্জন কর'। ইংরেজ শাসনের দেড়শ' বছর পর বিশ শতকের শুরুতে আমাদের দেশের অবস্থা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। বিলাতী কাপড়ে দেশ সয়লাব। দেশী তাঁতীদের বাঁচাতে তাই এখানে আওয়াজ ওঠে ঃ 'বিলাতী কাপড় বর্জন কর'।

বস্ত্র শিল্প ছিল আমাদের জাতীয় গৌরব। পরাধীন আমলে গৌরবের সে সূর্য অস্ত গেল। রাতের আঁধার নামলো শিল্প-সম্ভ্রমের দেশে। আমাদের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পীরা পরিচিত হলেন জোলা নামে। মুর্খেরা শব্দটিকে গালি হিসাবেও ব্যবহার করল ! ওদিকে ম্যানচেস্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের এলো নতুন প্রভাত। হারিয়ে যাওয়া সেই বয়নশিল্পী—তাঁতী ও জোলারাই আমাদের সোনালী অতীতের মর্যাদা ও অহঙ্কারের প্রতীক।

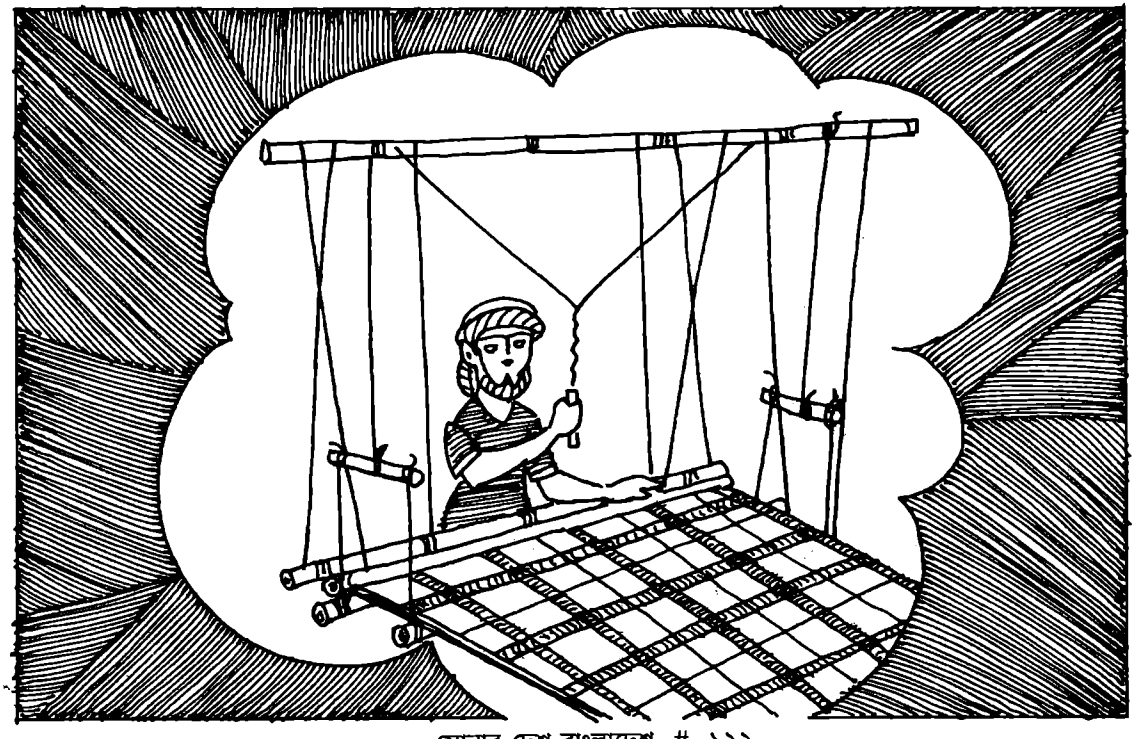

www.pathagar.com

সোনালী আঁশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাটের জন্ম

সোনার মতো রং। রেশমের মতো মোলায়েম শরীর। সোনালী আঁশ তার আদুরে নাম। পাট নামে পরিচয়। এই সোনালী আঁশের সাথে কখন থেকে কেমন করে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠলো সে কথা কেউ জানে না। পাট এলো কোথা থেকে। সঠিক করে কেউ বলতে পারে না তার উৎসের পরিচয়।

প্রাচীন গ্রীস, মিসর ও আরব সাহিত্যে এক প্রকার শাকের কথা আছে। অনুমান করা হয়, সে শাকই আমাদের তোষা পাট। এ থেকে মনে হয়, ভুমধ্য সাগর এলাকার কোন দেশ পাটের আদি জন্মস্থান। কিন্তু এটা শুধুই অনুমানের কথা।

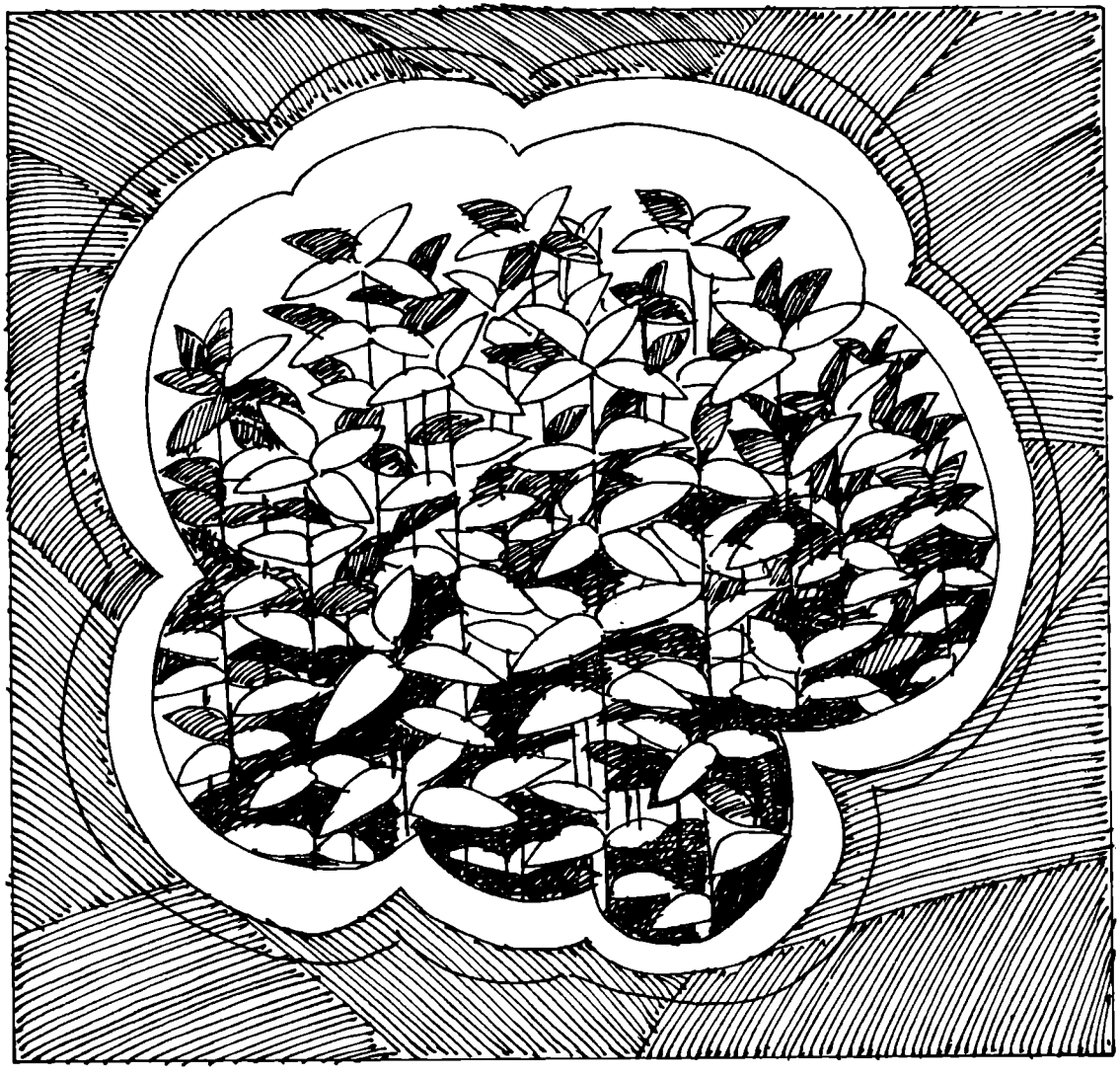

www.pathagar.com

বিদেশী ওইমোয়া ও মেলোকিয়াহ

বাইবেলে 'মেলো' নামের এক প্রকার উদ্ভিদের কথা আছে। এই 'মেলো'কে মনে করা হয় তোষা পাট। তারও আগের কথা। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের আটশ' বছর আগে লেখা 'মনু' নামক বই। তারও তিনশ' বছর আগের 'মহাভারত'। এ দু'টি বইতে পাটের কথা আছে। এ সব তথ্য থেকে বোঝা যায় পাট এই উপমহাদেশের পুরনো ফসল।

অনেকের ধারণা কোষ্টা জাতের পাট উমহাদেশে প্রথম আসে চীন দেশ থেকে। চীনের ক্যান্টন শহরের কাছে শত শত বছর ধরে কোষ্টার চাষ হচ্ছে। সেখানে এর নাম ছিল 'ওইমোয়া'। মিসরেও পাটের চাষ শুরু হয় প্রায় দু'হাজার বছর আগে। মিসরে এর নাম ছিল 'মেলোকিয়াহ'। সে-সময় সিরিয়ায়ও পাটের চাষ হতো।

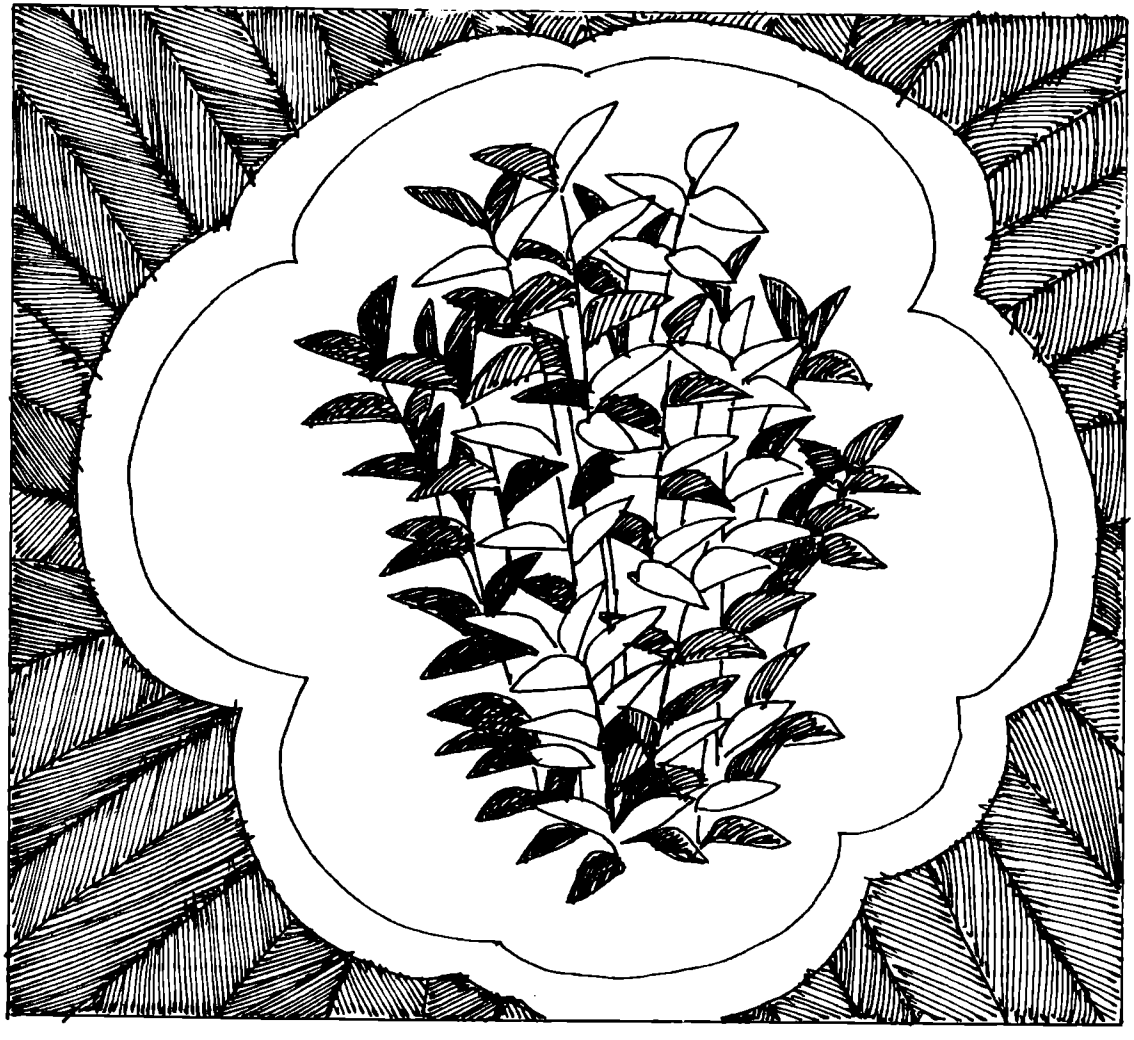

www.pathagar.com

খনার বচনের কোটা ভাই

আমাদের দেশে কোষ্টা বা কোটার উল্লেখ আছে প্রাচীন খনার বচনে ঃ

নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস ভাই।
কাপাস বলে কোটা ভাই।
জ্ঞাতি পানি না যেন পাই ॥

খনার বচনগুলির বয়স হাজার বছরের বেশী। খনার বচনে সেই পাটের কথা বলা হয়েছে। আরো পরে পাটের কথা আছে 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে। পনেরো শতকে বিজয়গুপ্ত 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন ঃ

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা
নামে টিয়াঠুটি,
সেই নায় ভরে সাধু
পাট আট ভুটি।

'টিয়াঠুটি' ডিঙ্গায় আট 'ভুটি' পরিমাণ পাট ভরার ঘটনা থেকে বোঝা যায় পাঁচশ' বছর আগে এদেশে পাটের ব্যবসা চালু ছিল।

www.pathagar.com

রামফিয়াসের বিবরণ

রামফিয়াস নামক একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ১৭৫০ সালের দিকে বাংলাদেশের পাট সম্পর্কে লিখেছেন ঃ পাটের স্থানীয় নাম Sajor Bengala. বাংলাদেশে পাট প্রচুর জন্মে। তাই নামের সাথে 'বেঙ্গালা' যুক্ত হয়েছে।

এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকেও সোনালী আঁশের আদি ঠিকানা পাওয়া যায় না। জানা যায় না পাটের সাথে আমাদের সম্পর্কের শুরু কবে থেকে। তবে বোঝা যায়, পাটের সাথে আমাদের আত্মীয়তা অনেক দিনের পুরনো।

www.pathagar.com

'করকোরাস' যার বংশ পরিচয়

পাট 'করকোরাস' জাতের উদ্ভিদ। 'করকোরাস' গ্রীক শব্দ। এ শব্দের অর্থ চক্ষুরোগনাশক। এক জাতের পাটের পাতা চোখের রোগে উপকারী। সেই থেকে পাটের বংশ পরিচয় 'করকোরাস'। পৃথিবীতে ছত্রিশ ধরনের পাটের কথা জানা যায়। সব পাটের পাতা চোখের রোগের ওষুধ নয়। তবু সব পাটের পরিচয় 'করকোরাস' নামে।

www.pathagar.com

বন পাট ও বনফুল

বাংলাদেশে দুই ধরনের পাট জন্মে ঃ কোষ্টা পাট আর নালিতা পাট। নালিতা পাট 'তোষা' ও 'বগি' পাট নামে পরিচিত। আমাদের 'কোষ্টা' আর 'নালিতা' পাট একেক সময় একেক নামে পরিচিত হয়েছে।

ঊনিশ শতকে এই দু'টি পাটের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন নামে। উত্তরিয়া, দেশী, দেওয়া, নারায়ণগঞ্জী, বাকরাবাদী, ভাটিয়ালী, করিমগঞ্জী, মীরগঞ্জী, জঙ্গীপুরী ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে 'বগি' বা 'তোষা' পাট জঙ্গলে জন্মাতো। সে কারণে এর সিন্ধী নাম 'বন পাট'। পাঞ্জাবী নাম 'বনফুল'।

www.pathagar.com

জুট এসেছে জাউট থেকে

ইংরেজরা পাটকে 'জুট' বলে। 'জুট' কিন্তু ইংরেজী শব্দ নয়। 'জুট' এসেছে পাটের উড়িয়া প্রতিশব্দ 'জাউট' থেকে। ইংরেজরা 'জাউট' শব্দটি শিখেছে ভারতবর্ষের উড়িয়া রাজ্যের মালীদের কাছে।

'জুট' শব্দটি সরকারীভাবে প্রথম ব্যবহার হয় ১৭৯৫ সালে। ডাক্তার রাক্সবার্গ নামক এক ইংরেজ এ সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এক বেল পাট পাঠান। তিনি এই পাটের পরিচয় দেন 'জুট অব দি ন্যাটিভস্'।

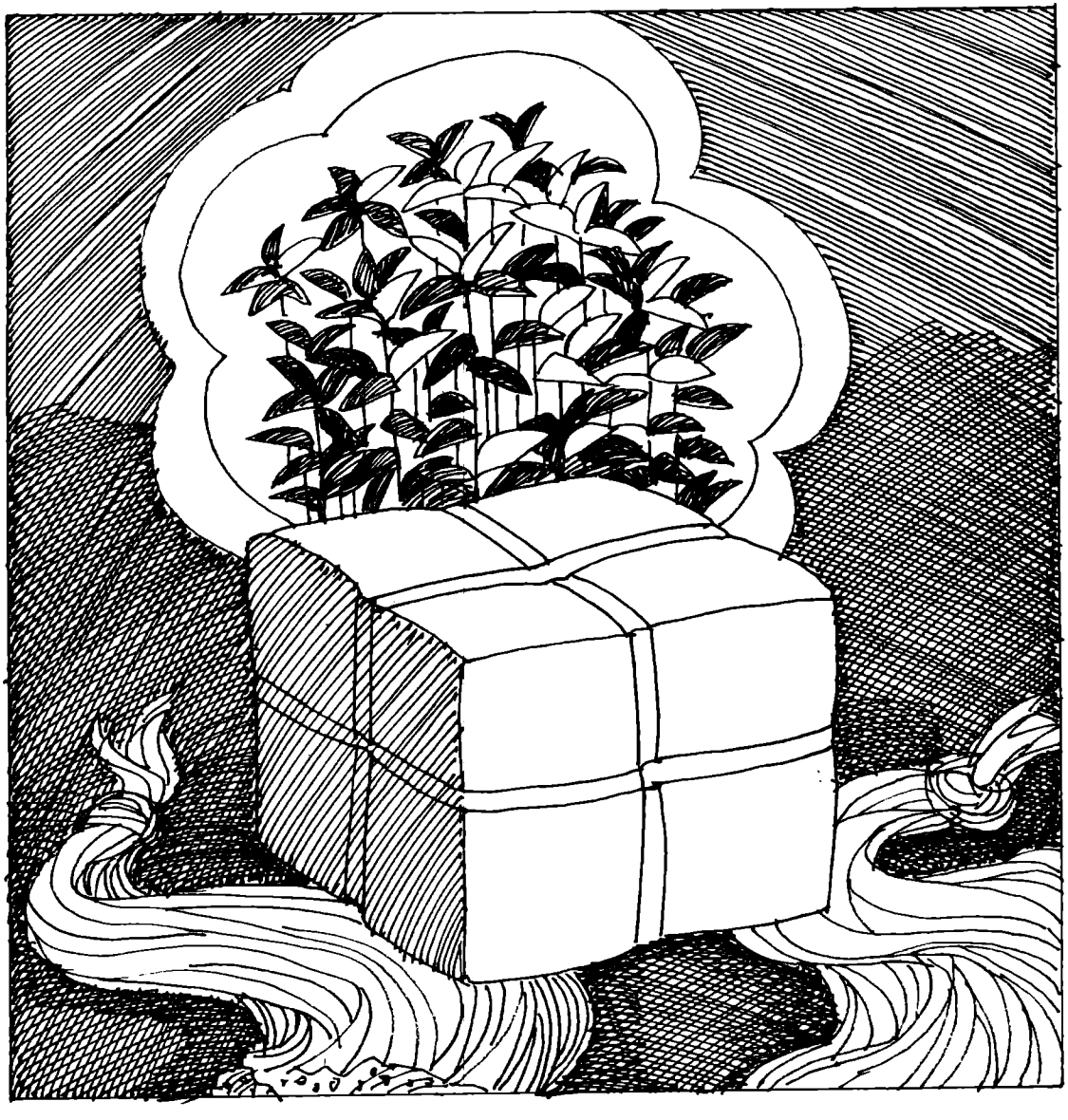

www.pathagar.com

আবুল ফযলের বিবরণ

আমাদের দেশের পাট শিল্প অনেক প্রাচীন। বাংলাদেশ পাটের কাপড় তৈরিতে অগ্রসর ছিল। পাটের আঁশে তৈরি এদেশের কাপড়ের কথা ষোল শতকে আবুল ফযল লিখেছেন।

আবুল ফযল সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর লেখা *আইন-ই-আকবরী* বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। সে বইতে বাংলাদেশের পাটের কাপড়ের প্রশংসা করা হয়েছে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই এদেশের তাঁতে তৈরী হতো নানা ধরনের পাটের জিনিস।

পাট বুননের তাঁত ছিল খুবই সাধারণ। সাদামাটা এই তাঁতে 'খানা' বা রীড থাকত না। 'মাকু'-কে বলা হতো 'ভায়া'। পাটের সূতা কাটা হতো 'টাকু'র সাহায্যে। 'ঘড়ঘড়া'য় তৈরী সূতা দিয়ে রশি পাকানো হতো।

www.pathagar.com

পাটে তৈরি নানা পণ্য

হাতে চালানো তাঁতে তিন ধরনের পাটের জিনিস তৈরি হতো।

এক ॥ রেশমের কোমল ও মসৃণ কাপড়। এছাড়া কার্পেট, চট ইত্যাদি।

দুই ॥ সূতা তৈরির পর পাটের আঁশের বাদ পড়া অংশ বা মেসতা দিয়ে তৈরি হতো কাগজ।

তিন ॥ নিম্নমানের পাট থেকে তৈরি হতো দড়ি ও রশি। পাটের তৈরি মিহি কাপড়ের নাম ছিল 'মেকলী ধোকড়া'। এ কাপড়ে লাল ও নীল রংয়ের ডোরা কাটা হতো।

বিছানার চাদর হিসাবেও ব্যবহার হতো পাটের কাপড়। এক ধরনের ফিনফিনে শাড়ীও পাট দিয়ে বোনা হতো। পাটের সাথে সূতা মিশিয়েও তৈরি হতো শাড়ী ও বিছানার চাদর। এছাড়া পাট দিয়ে তৈরি হতো ছালা, চট ও 'টাট' নামক কাপড়। 'টাট' ব্যবহার হতো মাদুর, নৌকার পাল ও থলে হিসাবে। 'কমপা' নামে পালের মতো বুনট করা এক ধরনের থলে তৈরী হতো। সে থলে কাঠ ও খড় বহনের কাজে লাগতো। এছাড়া পাট থেকে তৈরি হতো 'দুলিচা'। বিক্রমপুরে পাট দিয়ে 'বারবস্ত্র' নামে এক প্রকার 'ক্যানভাস' তৈরি হতো।

ষোল শতকে সূতার পরিবর্তেও আমাদের দেশের পাট ব্যবহার হতো। একথা জানিয়েছেন মুরল্যাণ্ড নামক একজন লেখক। পাট শিল্প তখন এদেশের বর্ধিষ্ণু শিল্প।

দিনাজপুর, রংপুর ও ত্রিপুরা পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। রিসলী নামক একজন ইংরেজ লেখকের বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

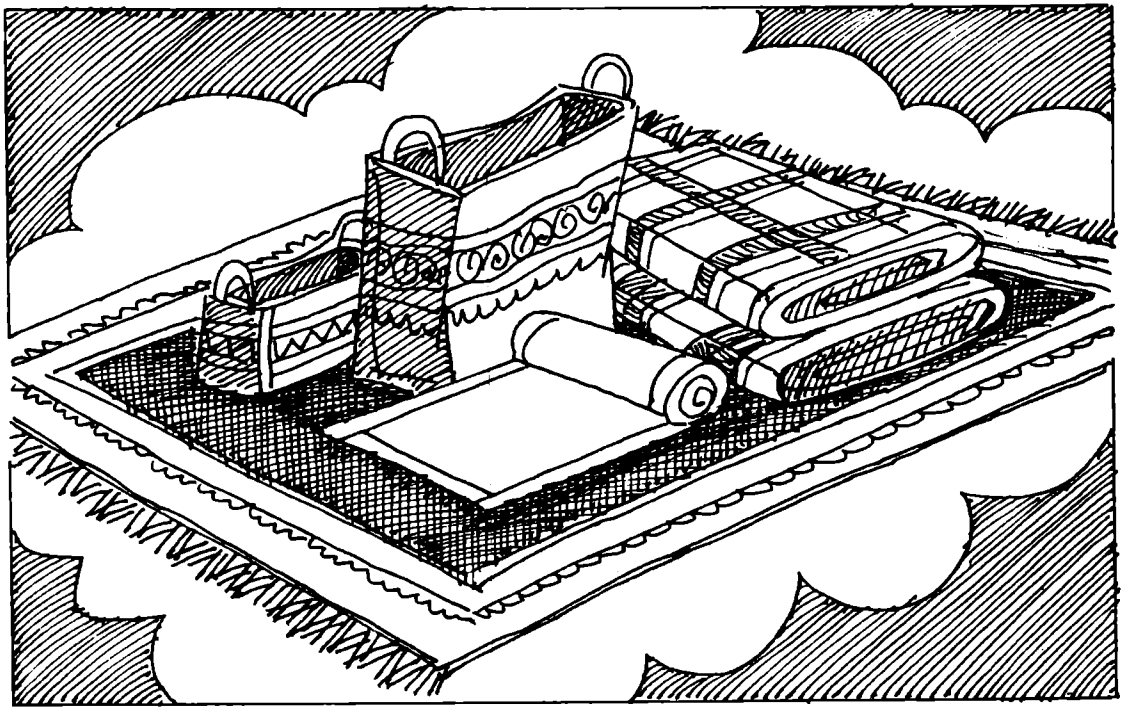

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সওদা যায় নানা দেশের ঘাটে

বাংলাদেশের পাটে তৈরি নানা পণ্য বিদেশে রফতানী শুরু হয় আজ থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে। সে কথা উল্লেখ আছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরনো কাগজপত্রে। এই রফতানী ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এসব জিনিস রফতানী হয় পৃথিবীর নানা দেশে। উত্তর আমেরিকা, মালাবার, পেনাং। সিঙ্গাপুর, পেগু, সিংহল, জাভা। মরিসাস, উত্তমাশা অন্তরীপ, গুয়ামা, হামবুর্গ।

আরব ও পারস্য উপসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত নানা পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সে সময় পাটের নানা পণ্য তৈরির কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল।

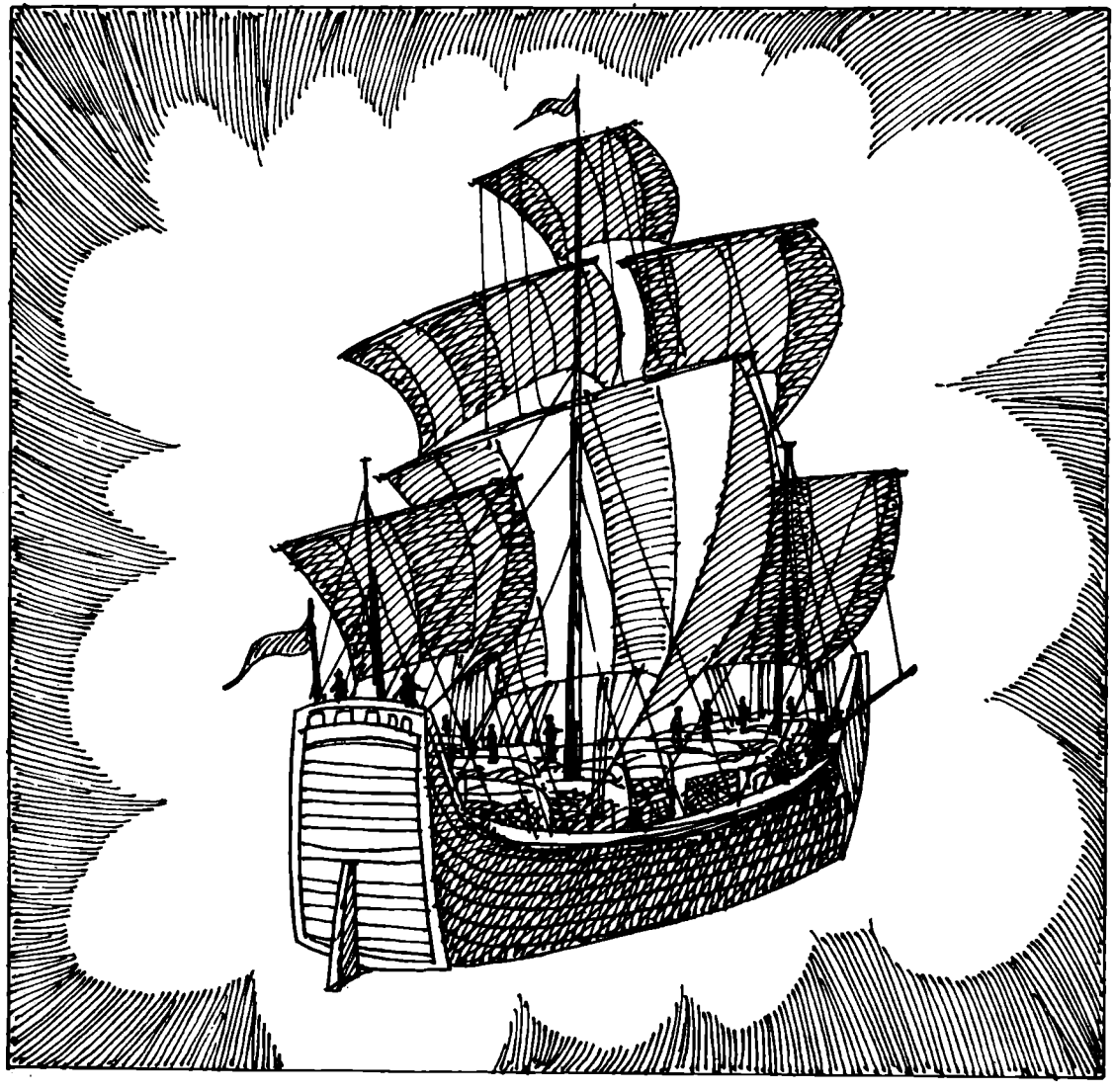

www.pathagar.com

ফুরিয়ে গেল সোনালী দিন

বাংলাদেশের সোনালী আঁশের সোনালী দিন ফুরিয়ে যায় এক সময়। আমাদের অন্যান্য শিল্পের মতো পাট শিল্প ধ্বংস হয় যন্ত্রচালিত পাটকল চালু হবার সাথে সাথে।

১৮৫৪ সালে কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে উপমহাদেশের প্রথম পাটকল চালু হয়। অকল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজ চালু করেন এই কারখানা। বাষ্পচালিত দ্বিতীয় পাটকল চালু হয় ১৮৫৯ সালে। ১৮৮৭ সালের মধ্যে ২৪টি পাটকল গড়ে ওঠে এ উপমহাদেশে। কিন্তু তার একটিও আমাদের বাংলাদেশে নয়।

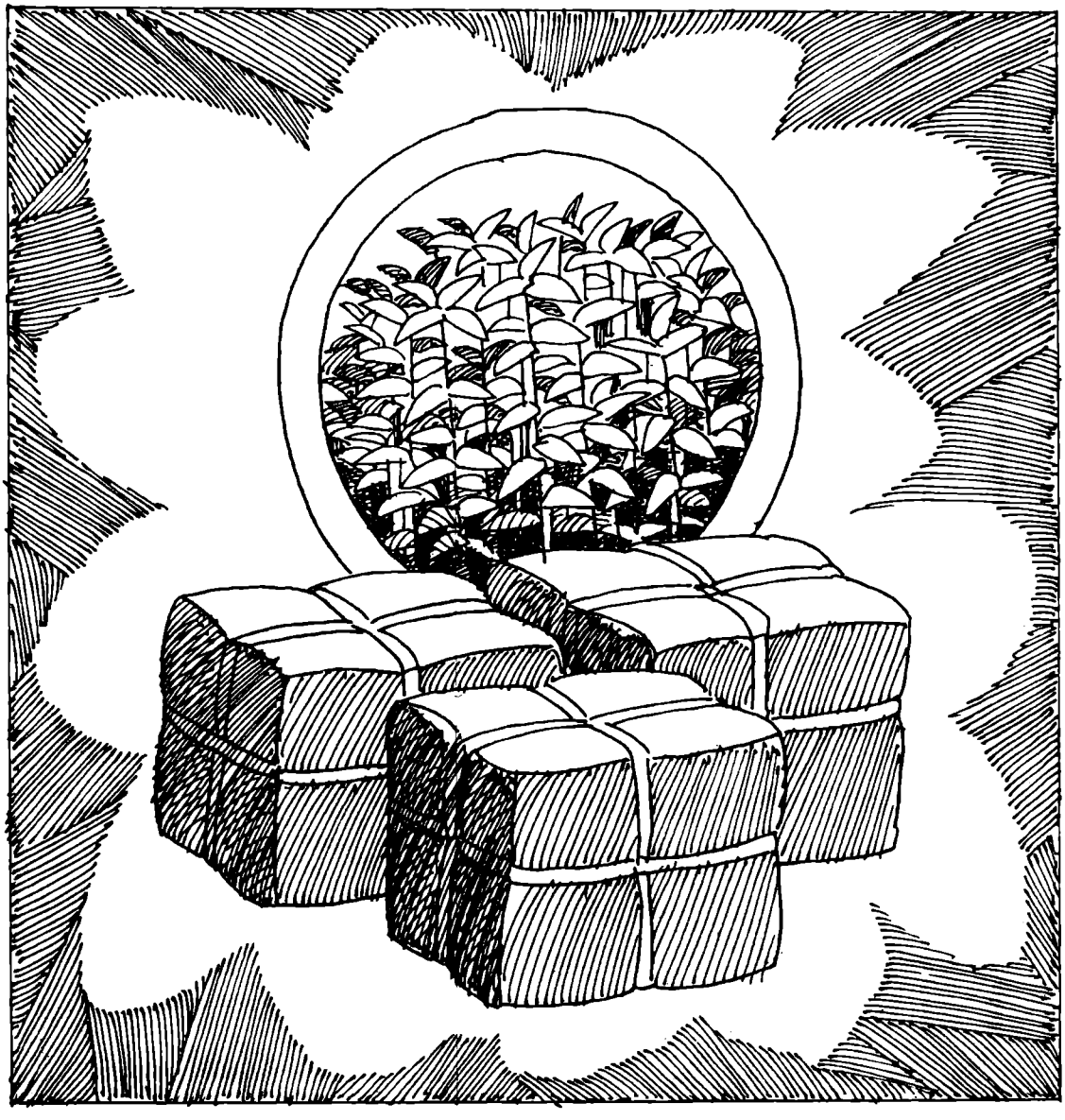

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পাট ; কলকাতার ঠাঁট !

পাটের উৎপাদন করে বাংলাদেশের কৃষক। কিন্তু পাটকল গড়ে ওঠে ইংরেজদের রাজধানী কলকাতার চারপাশে। ঢাকাকেন্দ্রিক গ্রামবাংলার পাটচাষীদের শোষণ করে রাতরাতি ধনী হয় কলকাতার জমিদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। ১৮৭৪ সালের মধ্যে বৃটেনে স্থাপিত হয় ১১০টি পাট কল। বাংলাদেশের কাঁচাপাট বিক্রি করে পশ্চিম বাংলার কলকাতা আর বৃটেনের ডাণ্ডিতে সম্পদের পাহাড় জমা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ শুধু কাঁচামালের বাজার হয়েই থাকে।

১৯৪৭ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর বাংলাদেশেও পাটকল গড়ে উঠতে শুরু করে। কয়েক বছরে বাংলাদেশে চালু হয় ৭৭টি পাটকল। তার মধ্যে আদমজী জুট মিল ছিল এশিয়ার বৃহত্তম।

তারপরও আমাদের সোনালী আঁশ নিয়ে চলে নানা ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি।

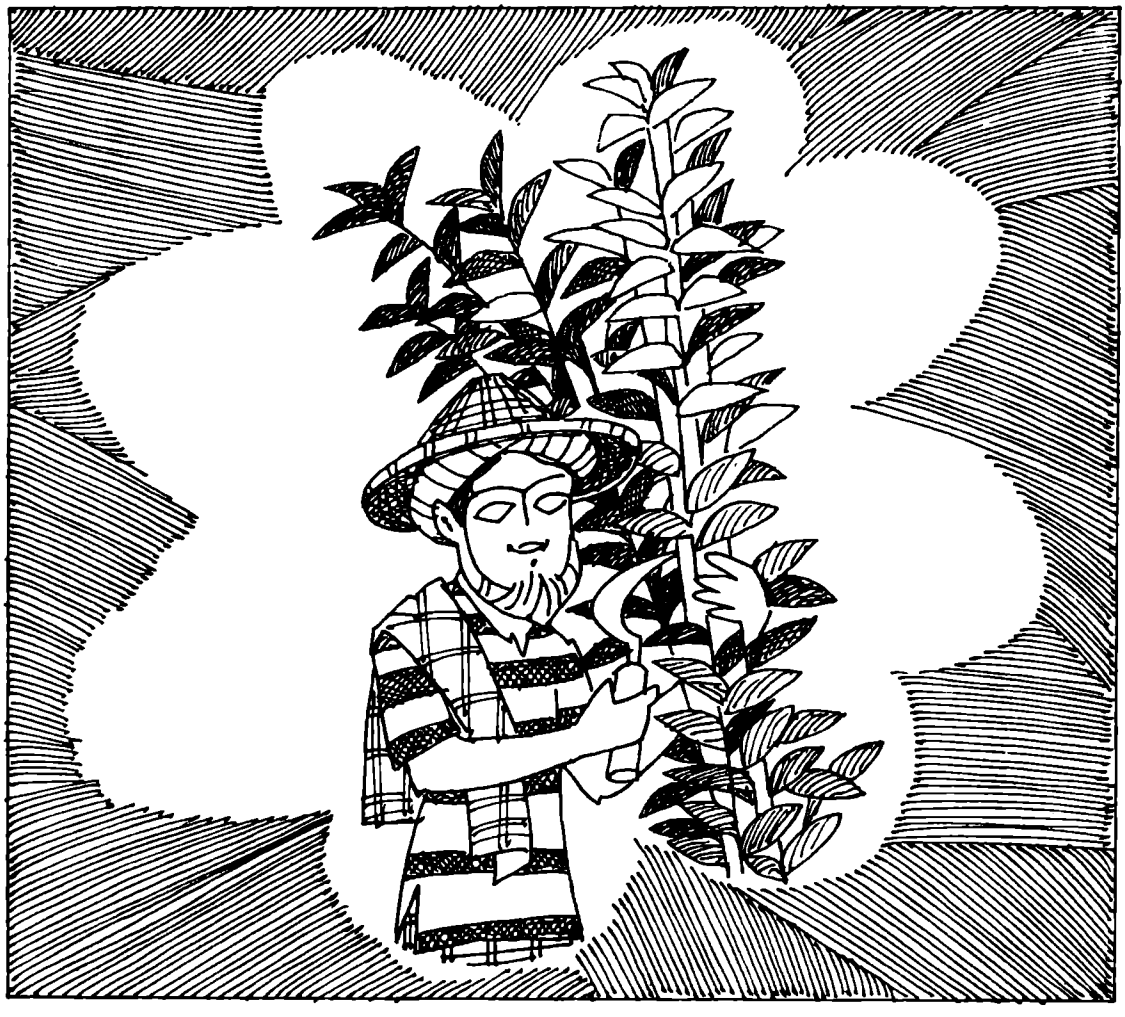

www.pathagar.com

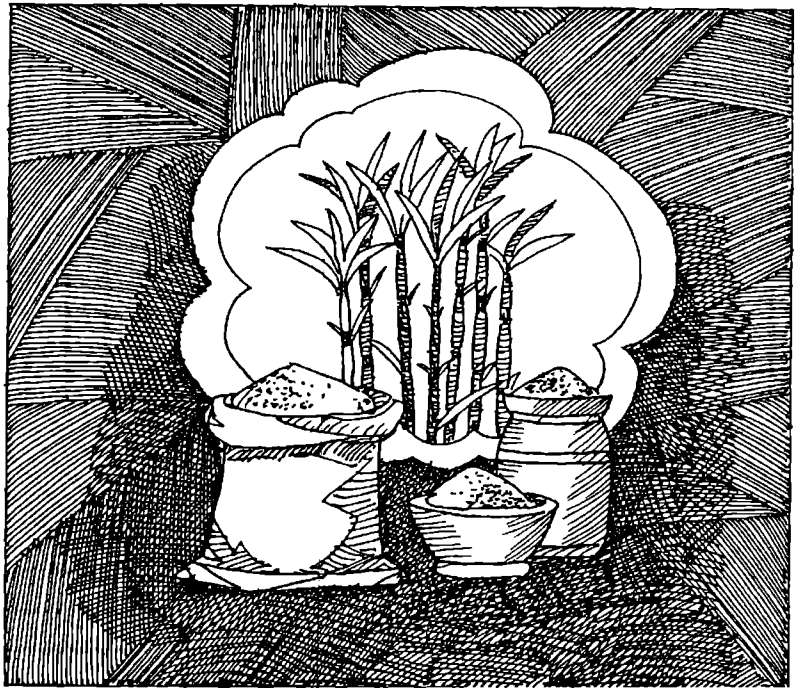

নলের মধু–চিনি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গৌড়ের নলের মধু

'গৌড়' আমাদের এক সময়ের রাজধানীর নাম। আমাদের দেশও এক সময় পরিচিত হয়েছে 'গৌড় রাজ্য' নামে। এই 'গৌড়' নামের উৎপত্তি 'গুড়' থেকে হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই প্রচুর গুড় উৎপন্ন হয়। সে গুড় থেকেই দেশের নাম হয়েছে গৌড়।

ফুলকিগার। হ্যানবারী। ক্যানিংহাম। তিনজন বিদেশী পণ্ডিত। তারাও মনে করেন, গুড় থেকেই গৌড় শব্দের উৎপত্তি। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে 'চরক' নামে একটা বইয়ে ইক্ষু বা আখের কথা আছে।

সেই বইয়ে আখের নাম 'পৌণ্ড্রক'। অনেকের মতে, 'পুণ্ড্রবর্ধন' থেকেই এই 'পৌণ্ড্রক' নামের আখ। বর্তমান উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন ছিল বাংলাদেশের একটি প্রাচীন অঞ্চল। পুণ্ড্রে জন্ম বলে আখের নাম হয়েছে পৌণ্ড্রক।

গুড় থেকে গৌড়। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পৌণ্ড্রক। এসব কারণে অনেকে মনে করেন বাংলাদেশই আখের জন্মস্থান।

বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের কথা নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক জ্ঞানকোষ। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা তেমনি একটি জ্ঞানকোষ। সে বইয়ে বলা হয়েছে ঃ বাংলাদেশ থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আখের চাষ শুরু হয়।

বাংলাদেশে আখ চাষ শুরু হয় অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে। এখানে চিনি শিল্প গড়ে ওঠে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মেরও দুই-তিনশ' বছর আগে।

www.pathagar.com

সাকারন নামের 'নলের মধু'

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৩৫ বছর আগের কথা। সে সময় 'ডিসকরাইড' নামক একজন লেখক চিনিকে এক ধরনের মধু বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'সাকারন' নামে এক প্রকার মধু আছে। সে মধু শক্ত ও দানাদার। ভারত ও আরব দেশে এই মধু নলের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্লিনী নামক আরেকজন প্রাচীন লেখক। সেই ৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছেন 'সাকারন'-এর কথা। তিনিও বলেছেন ঃ এই চিনি ভারত আর আরব দেশে নলের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৪৫ সালে এই 'নলের মধু' সম্পর্কে লিখেছেন এরিয়ান নামক একজন গ্রীক পর্যটক। যিনি আলেকজাণ্ডারের জীবনী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন ঈসা (আঃ)-এর জন্মেরও আগে।

আরেকজন লেখকের নাম আলেকজাণ্ডার এপ্রোডিয়েসাস। তিনিও আমাদের চিনিকে 'নলের মধু' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় এই মধু শক্ত, দানাদার, শাদা।

www.pathagar.com

'ওলা লাড্ডু'র কথা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চিনির কথা আছে। আখের রসে তৈরি নানা ধরনের চিনি ও মিছরীর তখন বিভিন্ন নাম ছিল। গুড়। মোদক গুড়। ভুরা। চিনি। ওলা লাড্ডু। মিছরী। সীতা মিছরী। আরো কত নাম।

শুক্র বর্ণ রস, নাম তার চিনি
তস্তু পর ভি আনেতে ওলা লাড্ডুখানি।।
পুন দুগ্ধ ভোগ দিয়ে তাহার ভিয়ান
অখণ্ড লাড্ডু কা হয় মিছরী তার নাম।

'আইন-ই-আকবরী' একটি বিখ্যাত বই। এই বই লিখেছেন সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সদস্য আবুল ফযল। ষোল শতাব্দীর সে বইতে আমাদের দেশের চিনির প্রশংসা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিদেশীদের চোখে

সতেরো শতকের পর্যটক বার্নিয়ার। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আছে বাংলাদেশের চিনির বর্ণনা। এ দেশে তখন প্রচুর চিনি উৎপন্ন হতো। তখনকার বাংলাদেশ ছিল চিনি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। বিদেশে চিনি রফতানী করে এ দেশের আয় হতো প্রচুর অর্থ।

কাশী থেকে রংপুর। আসাম সীমান্ত থেকে কটক। সর্বত্র আখ চাষ হতো। বাংলাদেশের সকল জেলায় চিনি উৎপাদিত হতো।

ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এ দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এক প্রকার অপরিশোধিত চিনি তৈরি হতো। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ইউলিয়াম হান্টার। তিনি ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে প্রচুর চিনি উৎপাদনের কথা বলেছেন। গ্যাটস্কেল জানিয়েছেন যশোর, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের চিনির কথা। হেনরী বিভারিজ বরিশালের চিনির প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ।

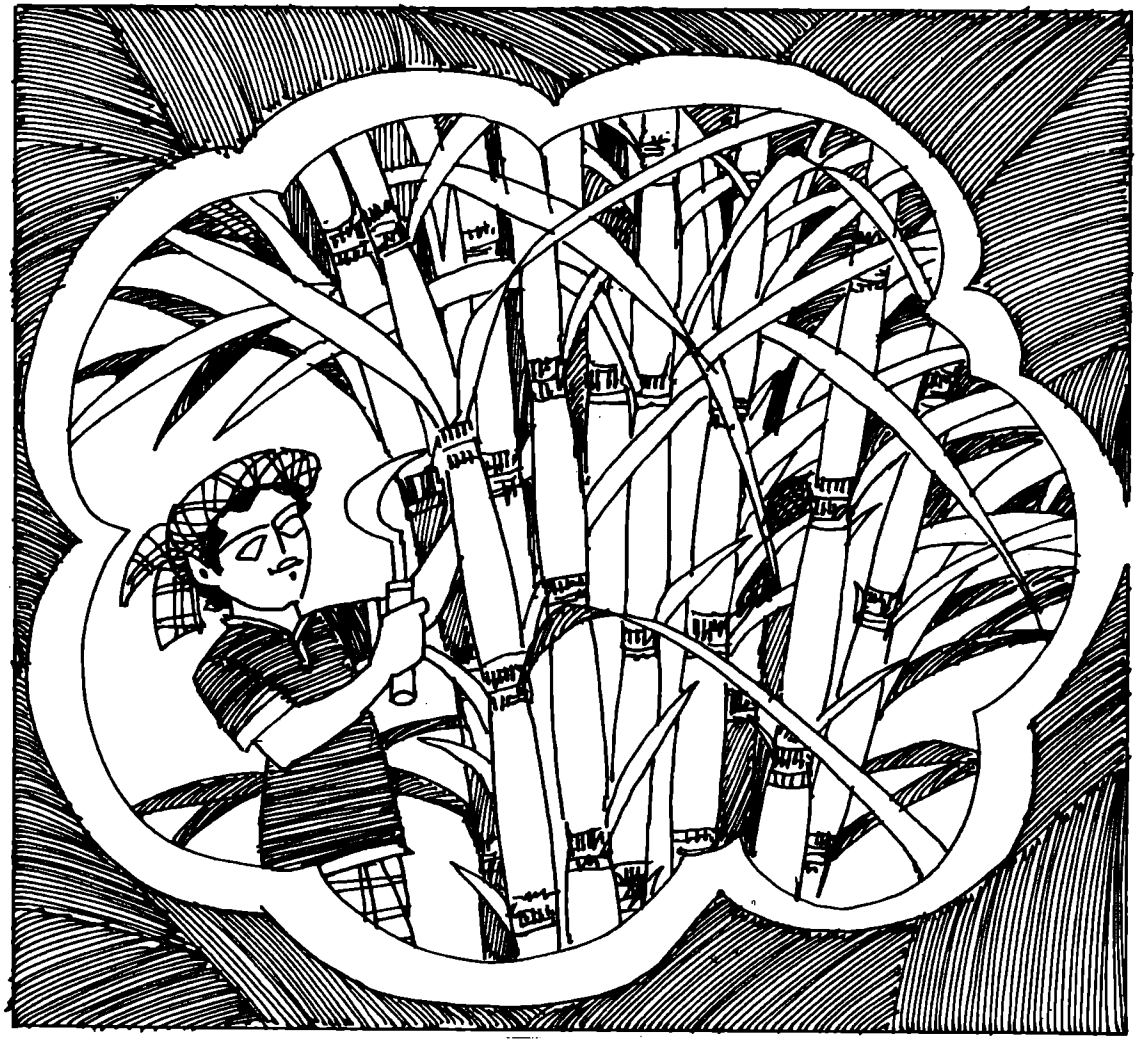

www.pathagar.com

আখ মাড়াই উৎসব

আখ মাড়াইয়ের সময় এখনো গ্রাম এলাকায় উৎসবের আমেজ পাওয়া যায়। গরম কড়াইতে আখের রস জ্বাল করার সময় মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে চারদিক। অতীতেও এভাবে আখ মাড়াই ও গুড় তৈরী করা হতো।

আগের দিনে আখ মাড়াইয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো তেঁতুল কিংবা অন্য কোন শক্ত কাঠের যাঁতি। আট দশ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি কাঠের স্ক্রু। সেটাকে ঘুরানো হতো গরুর সাহায্যে। আখ মাড়াই আর রস জ্বাল করতো কয়েকটি পরিবার এক সাথে মিলে। আখ থেকে চিনি উৎপাদনের কয়েকটি স্তর বা পর্যায় ছিল। সেগুলো হলো ঃ ফানত, মৎসণ্ডী, গুড়, শর্করা, পুষ্পিতা, খণ্ড, সিতোপলা।

www.pathagar.com

সুক্কার, সুকার ও শর্করা

আরবী শব্দ 'কন্দ'। তার সাথে মিল আছে আমাদের খণ্ডের। মালয়ী শব্দ 'গুল'। এর মিল আছে আমাদের গুড়ের। ফার্সী শব্দ সুক্কার। ল্যাটিন শব্দ সাক্কারান। ফরাসী সুকার। ইংরেজী সুগার। আমাদের দেশের শর্করা সেই একই পরিবারের শব্দ।

বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় গুড়কে খাঁড় বলা হয়। খাঁড় শব্দটিও খণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়।

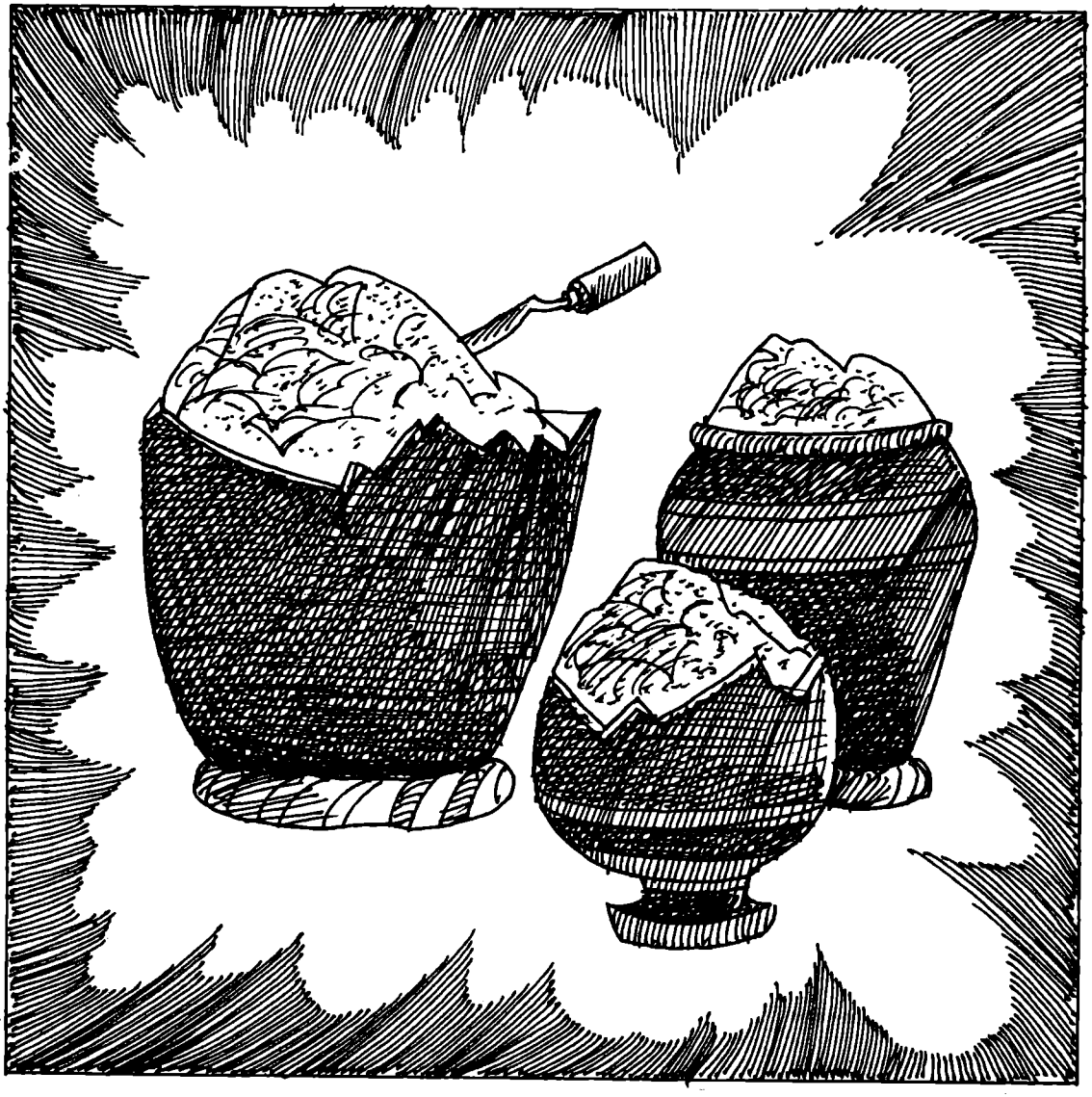

www.pathagar.com

বাংলাদেশের চিনি বাটে ; নানা দেশের হাটে হাটে

প্রাচীনকাল থেকেই দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমাদের চিনি রফতানী হতো নানা দেশে। সুদূর ইরাকের বসরা। ইরানের বন্দর আব্বাস। সৌদি আরবের জেদ্দা। ওমানের মস্কট। এসব বন্দরে চিনি নিয়ে আমাদের জাহাজ ভিড়তো। এছাড়া আমাদের চিনির চালান যেতো মাদ্রাজ, মালাক্কা, বোম্বে, সুরাট, কর্নাটক ও সিন্ধুতে।

আমাদের উপমহাদেশ থেকেই প্রথম আখ যায় আরবে। এরপর আরবরা আখ চাষ চালু করেন আরো অনেক দেশে। আরবের মুসলমানরা ৭০৩ সালে আখ চাষ শুরু করেন সিসিলিতে। সেখান থেকে আখের আবাদ হয় স্পেনে। তারপর আখ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে।

'দি ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার' নামে একটি বই। ১৮১৫ সালে লেখা সে বই পড়ে জানা যায়, প্রাচীন ইউরোপের লোকেরা তখনো আখের সাথে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। অথচ সে সময় বাংলাদেশের চিনি রফতানী হতো দুনিয়ার নানা দেশে।

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলে চিনি শিল্পের দুর্দিন

পরাধীন ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের সম্পদ লুট করে রাতরাতি ইংল্যান্ড ধনী হয়। সেখানে হয় শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন যন্ত্রপাতির প্রচলন হয় ইউরোপে। পরাধীন বাংলাদেশ সে উন্নতির সাথে তাল মিলাতে পারে না।

ইংরেজ সরকার আমাদের চিনির ওপর বিরূপ ছিল। এই অবস্থায় ১৮৪০ সাল থেকে ইউরোপের চিনি এদেশে আসতে শুরু করে। সে সময় পশ্চিম জার্মানীর বীট চিনি দুনিয়ার বাজার দখল করে।

১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বহু চিনি কল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আমাদের দেশে বিদেশ থেকে চিনি আমদানীর পরিমাণ বেড়ে যায়। বহুদিন চিনি ছিল বাংলাদেশের প্রধান রফতানী পণ্য। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে সে চিনি আমাদের প্রধান আমদানী দ্রব্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনে এভাবেই আমাদের শিল্পের গৌরব লুপ্ত হয়।

আমদানী করা চিনি ছিল সস্তা। তারপরও দেশী চিনির কদর ছিল বেশী। কিন্তু ময়রা-মুদী, শরবতওয়ালা, চায়ের দোকানদার প্রভৃতির মাধ্যমে সস্তা বিদেশী চিনি আমাদের দেশী চিনির স্থান দখল করে। দেশের উপায়হীন চাষীরা তখন বাধ্য হয়েই আখের জমিতে পাট বুনতে শুরু করে।

স্বাধীনতার পর থেকে আবার বাংলাদেশের আখ চাষীদের হারানো সুদিন ফিরে আসতে শুরু করেছে।

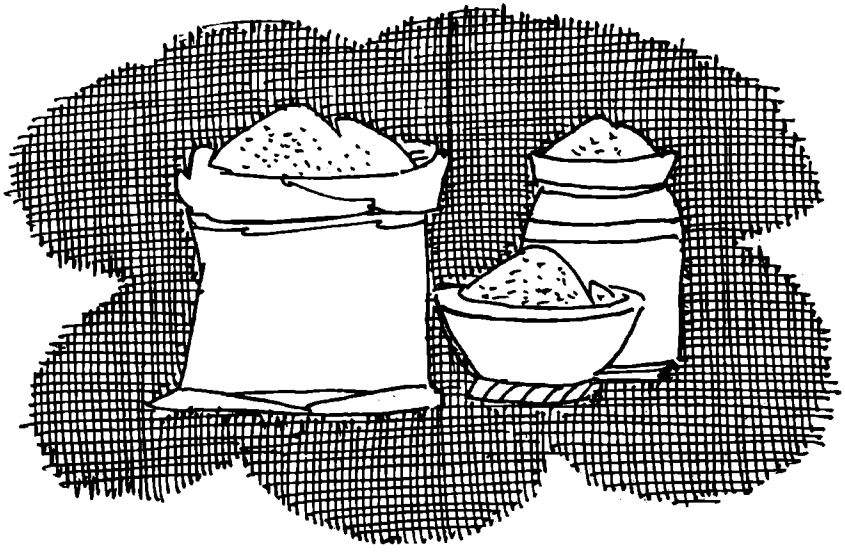

www.pathagar.com

লক্ষ থেকে লাক্ষা

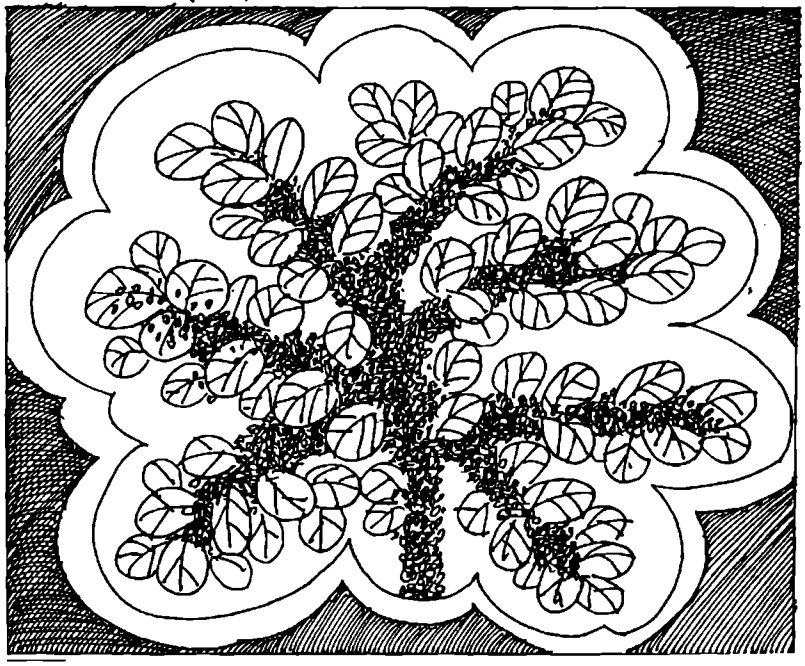

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লক্ষ প্রাণের দামের ফোঁটা — আলতা

কন্যা সাজবে বিয়ের সাজে। তারপর যাবে শ্বশুর বাড়ি। সে জন্য হলুদ, মেহেদী আর ফুলের মৌ-এর আয়োজন। আরো দরকার আলতা। আলতা পায়ে না দিলে কি কনের সাজ পূর্ণ হয়?

হলদি বাটো, মেন্দি বাটো
বাটো ফুলের মৌ
বিয়ার সাজে সাজবে কন্যা
সোনার বরণ বৌ ... ।

অতীতকালে এখনকার মতো রকমারি কসমেটিক্স কিনতে পাওয়া যেতো না। ঠোঁট রঙ করার লিপস্টিক। নখ রঙ করার নেইল পলিশ। এর সবই কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি। কৃত্রিম উপকরণ। অতীতে কনে সাজানো হতো হাতের কাছের নানা প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি দিয়ে।

বিয়ে কিংবা অন্য কোন সামাজিক উৎসব। সে জন্য আলতা চাই-ই। আলতা তো চাই। কিন্তু আলতা তৈরির রহস্য জানা আছে ক'জনার?

আলতা তৈরি হতো লাক্ষা দিয়ে। সে লাক্ষা তৈরি হতো লক্ষ কীটের জীবন দিয়ে। লক্ষ থেকে হয়েছে লাক্ষা নাম। হ্যাঁ, সে লাক্ষা থেকেই তৈরি হতো আলতা। রাঙা পায়ের এক ফোঁটা সোনা-রং আলতা। তার সাথে মিশে থাকতো লক্ষ-কোটি প্রাণ !

www.pathagar.com

লাক্ষার হাজারো ব্যবহার

আলতা শুধু নয়। লাক্ষা দিয়ে তৈরী হতো রক্তের মতো রং। সে রং দিয়ে রাঙানো হতো নানা জাতের কাপড়। লাক্ষা লাগতো পালিশ করার কাজে। ঘরের দরোজা-জানালা কিংবা অন্য আসবাবপত্র লাক্ষার পালিশে ঝলমলিয়ে উঠতো।

আমাদের দেশে এককালে লাক্ষা ছিল দামি পণ্য। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য। চারুকলা, গৃহস্থালী। সব কিছুতে ছিল লাক্ষার ব্যবহার। কাঠমিস্ত্রি কিংবা নৌকা ও জাহাজ নির্মাণের কারিগর। কামার, কুমার, স্বর্ণকার। পাথর খোদাইকারী। পুস্তক বাঁধাইকারী। কারুশিল্পী। কিংবা মুচি। সবাই লাক্ষা ব্যবহার করতেন। বার্নিশ, মোম, শিলিং, ইনসুলেটর সহ আরো কত কাজ। সবটাতেই লাগতো লাক্ষা।

www.pathagar.com

চিত্রে মনোহর দেখিতে সুন্দর লক্ষের বিয়নি

সবার সেরা ছিল লাক্ষার কারুকাজ। খেলনা কিংবা খাট-পালঙ্কের পায়া। পানদান, আতরদানী কিংবা ফুলদানী। হুকার মুখের নল কিংবা ছুরি-চাকুর হাতল। সব কিছুতে নকশী কারুকাজ করা হতো লাক্ষা দিয়ে।

লাঠি কিংবা ছাতির বাঁট। বল্লম কিংবা বাক্স। সব কিছুতে থাকতো লাক্ষার আঁকিবুকি। প্রতিটি কারুকাজের ছিল সুন্দর নাম। কুসুমী, বৈশাখী। আবরী, মেঘবরণ। আতশী, আগুনবরণ। আরো কত কি!

মধ্যযুগের লাক্ষার কারুকাজ করা একটি পাখার বিবরণ আছে কেতকী দাসের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে ঃ

চিত্রে মনোহর দেখিতে সুন্দর
লক্ষের বিয়নিখানি
আর লিখে তায় বিশেষ উপায়
পূর্ব পরিচয় বাণী ॥

এখানে 'লক্ষের বিয়নি' মানে লাক্ষার তৈরি পাখা। সে পাখায় লেখা থাকতো কত মধুর কথা, প্রাণের বাণী।

এছাড়া লাক্ষায় তৈরি হতো নানা অলংকার। এক প্রকার লাক্ষার নাম ছিল 'কুসুমী গালা'। 'কুসুমী গালা' দিয়ে তৈরি হতো গলার হার। মনে হতো গিনি সোনায় তৈরি। লাক্ষার তৈরি চুড়ি ছিল সবার আদরের।

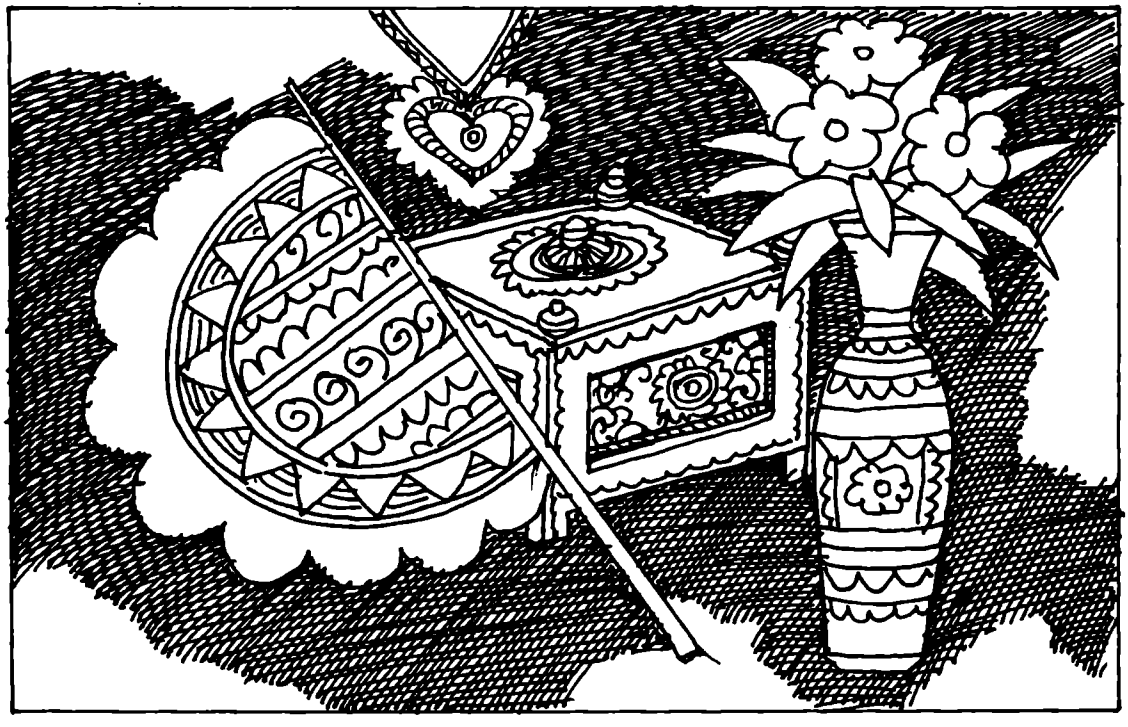

www.pathagar.com

প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ

আমাদের প্রাচীন শিল্প লাক্ষা। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এ শিল্পের কেন্দ্র ছিল। সিলেট, মোমেনশাহী, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালী। এসব জায়গার লাক্ষা শিল্পের কথা জানা যায় নানা বর্ণনায়। দেশী-বিদেশী লেখকগণ বর্ণনা করেছেন লাক্ষা শিল্পের প্রাচীন গৌরব।

দেশের বিভিন্ন গ্রামে লাক্ষা শিল্প চালু ছিল। লাক্ষা শিল্পের নিপুণ কারিগররা অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। সমাজে তাদের খুবই কদর ছিল। জানিয়েছেন উইলিয়াম হান্টার।

তারও অনেক অনেক আগে। প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে পঞ্চ পাণ্ডবের জতুগৃহের কথা। মহাভারতের পাণ্ডব পরিবারে পাঁচ ভাই মিলে পঞ্চপাণ্ডব। তাদের জতুগৃহ। 'জতু' শব্দটি লাক্ষার সংস্কৃত নাম। জতুগৃহ মানে লাক্ষার তৈরি ঘর। আমাদের দেশে লাক্ষা শিল্প কত প্রাচীন এ জতুগৃহ তার সাক্ষী। ৮০ খৃষ্টাব্দের 'পেরিপ্লাস' বইতে আছে লাক্ষা শিল্পের কথা। ২৫০ খৃষ্টাব্দের প্রাণীবিজ্ঞানী এলিয়ান লিখেছেন এ দেশের গাছের শাখায় লাক্ষা কীট পালনের কথা। সে কীট গুঁড়ো করে পানিতে ভিজিয়ে রং তৈরি করার বিবরণ।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আবু আলী ইবনে সিনা বেঁচেছিলেন ৯৮০ থেকে ১০৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সে মনীষীও আমাদের লাক্ষা শিল্পের কথা লিখেছেন। আরেকজন লেখক লিনশোটেন। ১৫৬৩ সালে তিনি উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের লাক্ষার কথা।

সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফযল। তাঁর নামকরা বই আইন-ই-আকবরী। সে বইতে আছে দরোজা-জানালা পালিশের কাজে লাক্ষা ব্যবহারের কথা। টেভারনিয়ার ছিলেন বিখ্যাত ভূ-পর্যটক। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় লাক্ষা সম্পর্কে বহু বিচিত্র কথা। এ দেশে তখন বিপুল পরিমাণ 'গালা লাক' বা 'গালা লাক্ষা' উৎপন্ন হতো।

গাছ থেকে লাক্ষা সংগ্রহ হতো। সে লাক্ষা থেকে পাওয়া যেত রক্তের মতো রং। রং তুলে নেয়ার পর যে লাক্ষা থাকতো, তা দিয়ে হতো আসবাবপত্রের কারুকাজ। লাক্ষা থেকে তৈরি হতো স্পেনিশ মোম।

www.pathagar.com

আরব বণিক ও লক্ষের সদাগর

প্রাচীনকালে আরব বণিকগণ আমাদের দেশে আসতেন পাল তোলা জাহাজ নিয়ে। তারা এ দেশ থেকে লাক্ষা নিয়ে যেতেন। আমাদের লাক্ষা যেতো পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে। সেখান থেকে লাক্ষার চালান যেতো ইউরোপে।

ইউরোপে আমাদের লাক্ষা পরিচিত ছিল 'অ্যারাবিয়ান রেজিন' বা 'ইথিওপিয়ান রেজিন' (Resin) নামে। আমেরিকায়ও লাক্ষা রফতানি হতো। টেভারনিয়ার দেখেছেন বিপুল পরিমাণে লাক্ষা রফতানি হচ্ছে চীন ও জাপানে।

মধ্যযুগের বিজয় গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে আছে আমাদের লক্ষ বা লাক্ষার সদাগরের কথা ঃ

প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যে নায়ে চলিল লক্ষের সদাগর।

সম্রাট আওরঙ্গজীবের আমলে লাক্ষা ছিল বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার একচেটিয়া বাণিজ্য পণ্য। ওলন্দাজ বণিকরা সে সময় এখান থেকে পারস্যে লাক্ষা রফতানি করতেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপে লাক্ষা রফতানী শুরু করে ১৬০৭ সালে। তার অনেক আগেই ইউরোপ ও আমেরিকায় লাক্ষা পৌঁছেছে আরব বণিকদের দ্বারা।

'কমার্শিয়াল প্রডাকট্স অব ইণ্ডিয়া' নামক বইতে ইংরেজ লেখক জেমস ওয়াট লিখেছেন বাংলাদেশের লাক্ষা দিয়েই ইউরোপীয়রা তাদের কাঠের আসবাবপত্র রং-পালিশ করা শুরু করে। এর আগে রং-পালিশ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের কোন ধারণাই ছিল না।

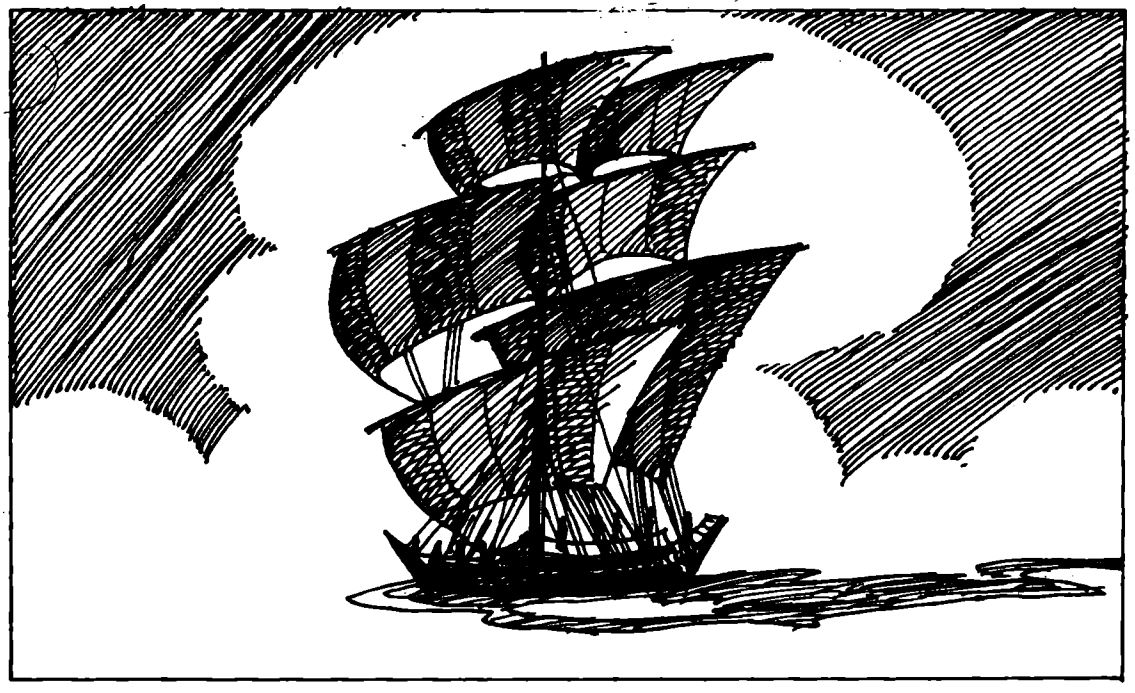

www.pathagar.com

বট, মহুয়া, আসনা, পলাশ, বাবলা। এ ধরনের প্রায় ষাট প্রকার গাছ লাক্ষা কীটের খুব প্রিয়। গাছগুলোতে লাক্ষা কীট পালন করা হতো।

একেকটি লাক্ষা কীটের দৈর্ঘ এক ইঞ্চির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এই কীটেরা গাছে হুল ফুটিয়ে তার রস পান করে। গাছের গায়ে এ পোকার বংশ-বৃদ্ধি হয়। এদের খোলস ক্রমশ একসাথে জমাট বাঁধে। ধীরে ধীরে গাছের গুড়ি থেকে ডাল, পাতা সবই আবৃত হয় লাক্ষা কীটে।

লাক্ষা কীটের খোলস জমে তৈরি হয় আস্তরণ। লাক্ষায় আবৃত সে শাখা কেটে ছায়ায় শুকানো হতো। শাখা শুকিয়ে সরু হলে টেনে সরিয়ে আনা হতো লাক্ষার আস্তরণ। সে আস্তরণ দেখতে অনেকটা টিউবের মতো হতো। এই লাক্ষা-দণ্ড লাক্ষার খামি নামে পরিচিত ছিল। কয়েক ধরনের যাঁতায় পিষে, ছাঁকুনীতে ছেঁকে খামির আবর্জনা সাফ করা হতো। মিহি চূর্ণগুলো রাখা হতো 'গালা'র জন্য। আর মোটা দানাগুলো বিক্রি হতো চুড়িওয়ালাদের কাছে।

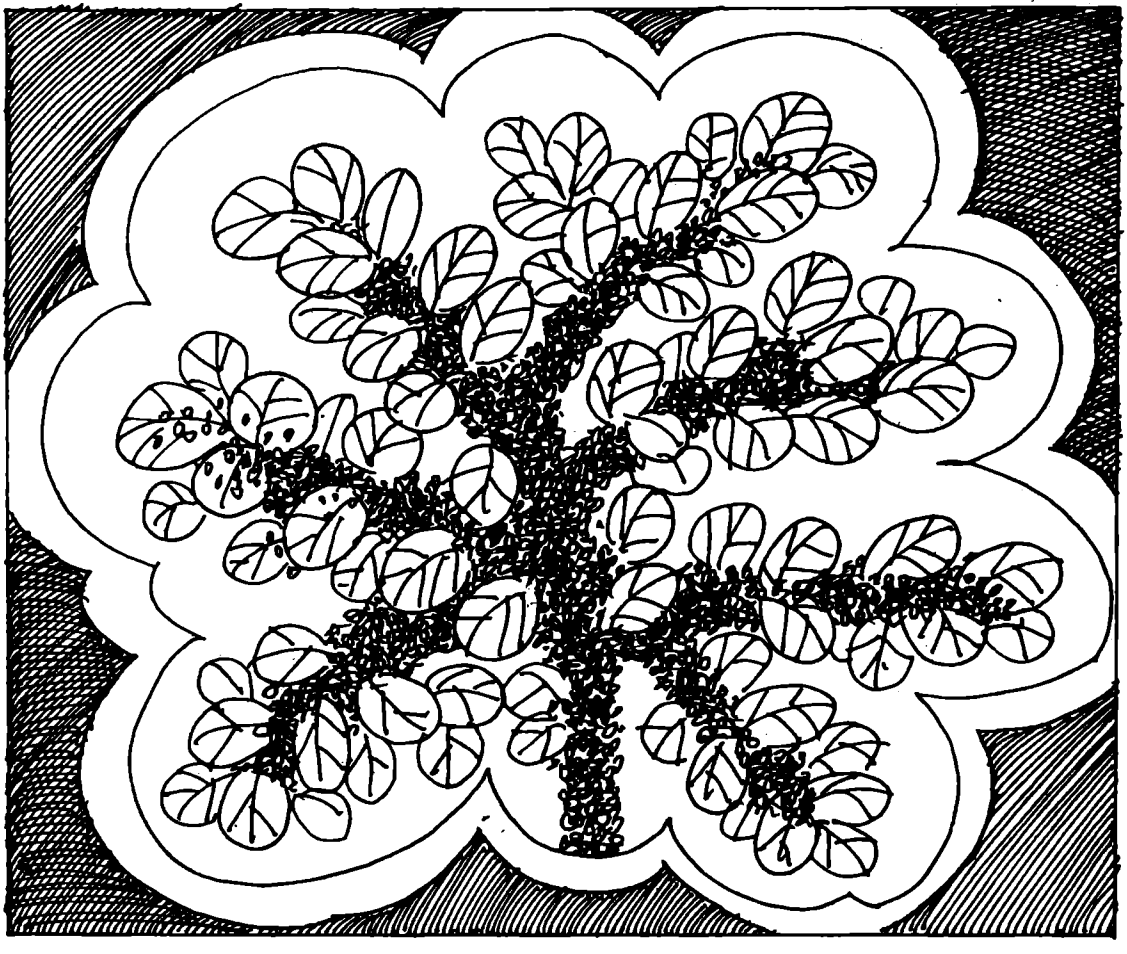

www.pathagar.com

লাক্ষার বরফি ও লাখদানা

লাক্ষার মিহি গুঁড়া বা 'খুদ' পানিতে ভিজিয়ে হাত বা পা দিয়ে কচলানো হতো। ধীরে ধীরে পানি হয়ে উঠতো লাল। সে লাল পানি একটা বড় চৌবাচ্চায় রাখা হতো। চব্বিশ ঘণ্টা পর নীচে জমা হতো গাদ। গাদ ছেঁকে শুকিয়ে বরফির মতো কাটা হতো। তারপর বিক্রি করা হতো লাক্ষা-রঞ্জক বা রেজিন হিসাবে।

রং বের করে নেয়ার পর যা থাকতো তাকে বলা হতো 'লাখ দানা'। সে 'লাখ দানা' বিশেষ কায়দায় ছাঁচ গালায় পরিণত করা হতো।

লাক্ষার খামিতে রজন বা বার্ণিশের উপাদান থাকতো ৬৮ ভাগ। রং-এর পরিমাণ ১০ ভাগ। মোম ৬ ভাগ। আঠা ৫ ভাগ। মাড় ৬ ভাগ। আর বাকী ৪ ভাগ ধূলা-বালু।

বাংলাদেশে বছরে দু'বার লাক্ষা সংগ্রহ করা হতো। প্রথমে কার্তিক থেকে পৌষ মাসে। দ্বিতীয়বার বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে। একেক সময়ের লাক্ষার ছিল একেক গুণ। নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কুসুমী, রঙিন, বৈশাখী, জলচালা। আরো কত সুন্দর নাম।

আমাদের দেশের সে শিল্পের কথা আমরা হয়ত ভুলে গেছি। কুসুমী, বৈশাখী, আবরী, আতশী। মনোহর এমনি সব লাক্ষার কারুকাজ এখন ইতিহাস মাত্র! কিন্তু এ-ইতিহাস আমাদের ; সোনার দেশ বাংলাদেশের।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সোনার দেশ বাংলাদেশ

ISBN 984-642-133-8

www.pathagar.com